৪২শ বর্ষ, (অগ্রহায়ণ ১৩২৪
১ম খণ্ড, হইতে কার্ত্তিক, ১৩২৫)

নারায়ণ

(অগ্রহায়ণ ১৩২৪ হইতে কার্ত্তিক ১৩২৫)

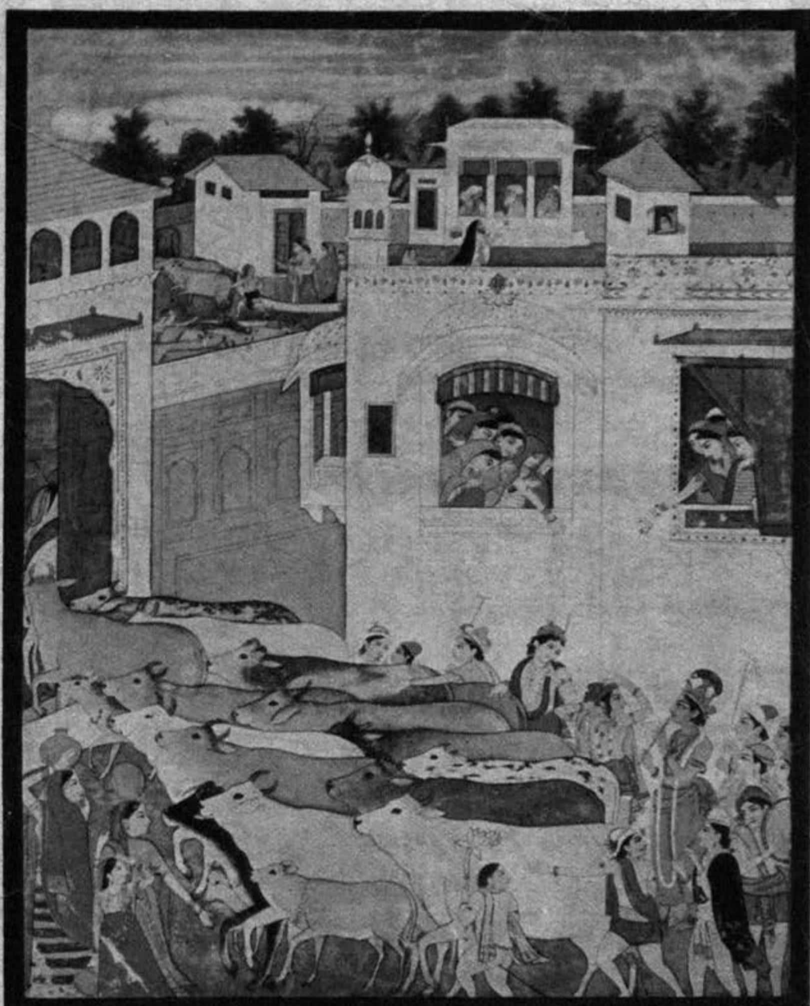
৪র্থ বর্ষের সূচীপত্র

(বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়			পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

(লেখক ও লেখিকাগণের বর্ণানুক্রমিক নাম)



গোষ্ঠ

(রাজপুতনার চিত্র)

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা] [অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সাল।

নারায়ণ

মানুষ চিরদিন দেবতার নাম করিয়া কেবল মানুষকেই খুঁজিয়াছে। আমাদের বেদের বড় বড় দেবতারা বড় বড় মানুষ।

যে মানুষকে চক্ষে দেখি, সে মানুষকে দেবতা বলিয়া ধরিতে সহসা সাহস হয় না। সে মানুষ জন্মে ও মরে। এই মানুষের মধ্যে নিত্যবস্তু কিছু ধরিতে পারি না। সেই জন্ম এই দেহধারী মানুষকে দেবতারূপে বরণ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই মানুষকে ঠিক দেবতা করিতে না পারিলেও, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতে দেবতা-জ্ঞানে যাহাদের ভজনা করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে এই মানুষেরই মতন একটা-কিছু কল্পনা করিয়াছে।

মানুষ নিজের ভিতরে যে সকল শক্তিসাধ্যের সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু যে সকল শক্তিসাধ্য দিয়া, তার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা অসম্ভব ও অসাধ্য ভাবিয়াছে, সেই সকল শক্তিসাধ্যকে অনন্তগুণ করিয়া তার দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে। নিজের ভিতরে মানুষ যার সাড়ামাত্র পাইয়াছে, কিন্তু যাহাকে পরিপূর্ণরূপে ধরিতে ছুঁইতে পায় নাই, সেই বস্তুকে ধরিবার ছুঁইবার আশাতেই সে দেবতাসকলকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

১

বেদের বড় দেবতা ইন্দ্র। এই ইন্দ্রের আর এক নাম—সহস্রলোচন, সহস্রাক্ষ। কিন্তু মানুষ ছাড়া অমন সুন্দর চক্ষু আর কার আছে?

বেদে বিষ্ণুকে সহস্রবদন বলিয়াছেন। মানুষ ছাড়া বদনই বা আর কার আছে?

যে-মানুষকে চক্ষে দেখি, তার দুটি বই চক্ষু নাই। এই জন্যই সে সবদিক্ দেখিতে পায় না। ইন্দ্র দিক্‌পাল, দশদিক্ রক্ষা করেন। দুটি চোক দিয়া দশদিক্ দেখা যায় না। সুতরাং দিক্‌পাল ইন্দ্রের দশচক্ষু চাই। কিন্তু দিক্ দশ হইলেও, এই দশ দিকের প্রসার বিশ্বব্যাপী, অনন্ত। সুতরাং ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু হইল। বিষ্ণুও দিক্‌পাল। বেদে বিষ্ণু কখনও ইন্দ্র, কখনও সূর্য্যরূপে উপাসিত হইয়াছেন। দিক্‌পাল বলিয়া বিষ্ণুরও সহস্রবদন থাকা চাই। সূর্য্যের ত কথাই নাই।

এইরূপে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু, অগ্নি—বেদের যত দেবতা, সকলেই মানুষের মতন, সকলেই বড়, অতি বড়, অনন্ত-মানুষ। মানুষের ইন্দ্রিয়াদিকে অনন্তগুণ করিয়া, মানুষের শক্তিসাধ্যকে অনন্তরূপে কল্পনা করিয়া, এই সকল দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

২

বেদের বড় বড় দেবতা ঠিক শরীরীও নহেন, ঠিক অশরীরীও নহেন। ইন্দ্রাদিতে শরীরী ও অশরীরীর, দেহী ও বিদেহীর, সাকার ও নিরাকারের একটা মাখামাখি দেখিতে পাই। আমাদের দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড় দেহ তাঁদের আছে। আমাদের ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনন্তগুণ বেশী ইন্দ্রিয় তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁদের শরীরাদি সর্ব্বদা আমাদের চক্ষুগোচর হয় না। তাঁরা সর্ব্বদাই আমাদের দেখেন, শোনেন, কিন্তু সর্ব্বদা আমাদের কাছে থাকিলেও চোক মেলিয়া তাঁদের দেখিতে পাই না। তাঁরা কথা কহেন, কিন্তু সর্ব্বদা সে কথা আমরা কান দিয়া শুনিতে পাই না। কেবল মন দিয়া, মানসচক্ষে ধ্যানাবেশেতেই বৈদিক ঋষি তাঁদের রূপ দেখিতে ও বাণী শুনিতে পাইতেন।

বৈদিক উপাসকের নিজের জ্ঞানেতেই দেহ যে জীবের সর্ব্বস্ব নহে, দেহ ছাড়া যে তার আর একটা কিছু আছে, যাহাতে দেহকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে, দেহের নাশে সে বস্তুর নাশ হয় না—এ সকল ভাল করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। তখনও দেহাত্মাধ্যাস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। দেহেতে ও আত্মাতে একটা মাখামাখি ছিল।

৩

উপনিষদই প্রথমে, পরিষ্কার করিয়া জীবের দেহ যে তার আত্মা নয়, এই আত্মা-বস্তু যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, দেহের কোনও ধর্ম্ম যে এই আত্মাতে নাই,—এ সকল তত্ত্ব প্রচার করিলেন।

এই আত্মতত্ত্ব-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার রূপ বদ্‌লাইয়া গেল। মানুষ যখন দেহী হইয়াও দেহের একান্ত অধীন আর রহিল না, দেহ ছাড়াও মানুষ থাকে,

মৃত্যুর পরেও থাকে; মানুষের মধ্যে যে নিত্যবস্তু, যে অজর অমর বস্তু আছে, তাহা তার দেহ নহে, কিন্তু আত্মা; এই আত্মাকেই মানুষ "আমি" বলিয়া নির্দ্দেশ করে—

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্"—

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, ইহা প্রাণীদিগের অন্তরের নিগূঢ়তম স্থানে অবস্থান করে;

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"

এই আত্মা আসীন অর্থাৎ একই স্থানে থাকিয়াও দূরে বিচরণ করে, শয়ান হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করে;

"অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্"

এই আত্মা অনিত্য শরীরে থাকিয়াও বস্তুতঃ অশরীরী—

এই সকল তত্ত্ব যখন প্রকাশিত হইল, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে যখন আপনার শরীর অপেক্ষা বড়, শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম, শরীর হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র, বস্তুতঃ অশরীরী বলিয়া ধরিল বা ভাবিল, তখন তার দেবতাও তার নিজেরই মতন অশরীরী হইয়া গেলেন। মানুষ তখন তার দেহটাকে অনন্তগুণ করিয়া আর দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতে গেল না; কিন্তু আত্মাটাকেই বড় করিয়া ব্রহ্মের বা বিশ্বাত্মার বা পরমাত্মার উপাসনায় নিযুক্ত হইল।

৪

এই নিতান্ত নিরাকারবাদও বেশী দিন টিকিল না। এই নিরাকারবাদ প্রত্যক্ষ জগৎটাকে ও জীবের দেহকে উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু এই জগৎ-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিল না। আত্মাটা যেমন সত্য, প্রত্যক্ষ বস্তু; অনুভব দিয়া ইহা বুঝি যে দেহ ছাড়া একটা কিছু আছে, যাহার দ্বারা এই দেহ আপনার কর্ম্ম করে। সেইরূপ এই দেহটাও যে আছে, আর এই দেহের দ্বারা যে সকল শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় পদার্থের জ্ঞান লাভ করি ও এ সকলকে ভোগ করিয়া থাকি, সে জগৎটাও আছে, ইহাও অনুভবে বুঝি। এই দেহটা ও জগৎটাকেও ত নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

নিরাকার আত্মাই যদি বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব হয়, তবে এই দেহের ও জগতের উৎপত্তি হয় কেমনে? "নাসতো সজ্জায়তে" অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই, তাহা হইতে সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, তার উৎপত্তি ত সম্ভব হয় না। অতএব এই দেহ ও জগৎকে আত্মারই পরিণাম, দুধ হইতে যেমন দই হয়, সেইরূপ সেই আত্মা হইতে এই জগৎ ও জীব জন্মিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

আর এটি স্বীকার করিলে, এই জগৎকে ও জীবকে ঐ আত্মার মধ্যে, তার নিত্য-প্রকৃতির ভিতরে, সেই প্রকৃতির অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে, এই বিশ্ব-সমস্যার কোনও নিঃশেষ মীমাংসা হয় না।

৫

এই রূপেই উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন জীব ও ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া ধরিয়াছিল, ভাগবত তাহা করিতে পারিল না। ভাগবত এই জীবকে ও এই জগৎকে তার নিত্য-স্বরূপেতে—শ্রীভগবানেতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এই সমস্যার মীমাংসা করিল।

এই জন্য ভগবান্ কেবল নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহেন; কিন্তু চিদাকার-সম্পন্ন। ভগবানের আকার ইন্দ্রাদি কল্পনার মতন, অতি-মানুষী আকার নহে। মানুষের দেহ-টাকে ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে অনন্তগুণ করিয়া শ্রীভগবানের দেহ কল্পিত হয় নাই। কিন্তু এই দেহের শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ, পরিপূর্ণ-স্বরূপেই শ্রীভগবানের দেহের ধারণা হইল।

চিত্রকর ও ভাস্কর মানসচক্ষে মানুষের যে রূপ দেখিয়া তাহাকে চিত্রপটে বা মর্ম্মর-খণ্ডে ফুটাইতে চাহেন, কিন্তু প্রাণপাত করিয়াও ফুটাইতে পারেন না; সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপই শ্রীভগবানের রূপ।

মানুষ কেবল শরীরী নহে। কেবল অশরীরীও নহে। মানুষ যে কি, এই চোক দিয়া ত তাহা দেখিতে পাইলাম না। এই সকল ইন্দ্রিয়ের কোনটাই ত মানুষের রূপ-রস-গন্ধের পূর্ণ আস্বাদন পাইল না। এই মানুষের ভিতরে সর্ব্বদাই এমন একটা কি-যেন-কি'র সাড়া পাই, যাহাকে এই রক্ত-মাংসের দেহ বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি না, আবার এই দেহ যে একেবারেই নয়, অর্থাৎ তার যে রূপ বা অঙ্গ-সমাবেশ নাই, স্পর্শাদি ধর্ম্ম নাই, তাহাও বলিতে পারি না। এই বস্তু তাহা—যাহা মানুষের মধ্যে ফুটে ফুটে, কিন্তু যেন ফুটে না। যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে, কিন্তু আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

এ আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি যেখানে ও যাহার মধ্যে, আমাদের ভাগবতেরা তাঁহাকেই শ্রীভগবান্ বলিয়া ভজনা করিয়াছেন।

এই জন্যই ভগবান নর, নরোত্তম। এই ভগবান নারায়ণ। নর ভগবত-তত্ত্বের বীজ। নরোত্তম এই তত্ত্বের ফল। নর ও নরোত্তমকে ধারণ করিয়া, নারায়ণ এই তত্ত্বের সাকুল্য বৃক্ষ-স্বরূপ। আর যে ভগবদ্রসের দ্বারা নর ও নরোত্তম পরিপুষ্টিলাভ করেন, যে রস নরেতে ও নরোত্তমেতে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদের ফুটাইয়া তোলে ও বাঁচাইয়া রাখে, সেই চিদানন্দ-রসকেই ভাগবত সরস্বতী বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

এই জন্যই ভগবল্লীলা-কীর্ত্তনকালে সর্ব্বাদৌ নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়ধ্বনি করিবে—এই উপদেশ আছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতা

(দ্বিতীয় কল্প)

আমার বাঙ্গলার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। বাঙ্গলার যেমন শ্যামলশ্রী রূপ, যেমন নধর সবুজ তৃণের কোমলতা, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার বাঙ্গলার আদর্শও তেমনি সেই শ্যামলশ্রী, সেই—

"নব রে নব, নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব"

হেরিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। বাঙ্গলার গানের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের যে অবিচ্ছিন্ন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্পর্ক আছে, সেই মিনিসূতার মালার গাঁথনির কথা আপনাদের শুনাইব বলিয়া, আজ আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি।

বাঙ্গলার এক অখণ্ড সত্য আছে, সেই সত্য, যুগে যুগে যখনি যাহার মরমের নিভৃত আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তখনি এই মাটীর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয় পাইয়া আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয় নাই, প্রাণে প্রাণে সেই মিলনবাণী 'লোকহিতায়' 'জগতে ধর্ম্মস্থাপকায়' দেশে দেশে বিলাইয়া দিয়াছে। সেই পরিচয় হইতেই কলাকলার সৃষ্টি, সেই পরিচয়েই ধর্ম্মের স্থাপন, সেই পরিচয় হইতেই মানুষেব সমাজ, শ্রদ্ধা, সংস্কার। সেই মিলনেই এই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রসমূর্ত্তি বুকের ভিতর আঁকিয়া লইয়া জাতি আপনাকে বিকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গলার একদিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালী আপনাকে সেই পরিচয়ের জোরে জগতের কাছে বাঙ্গালী বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার বুকের ভিতর হইতে সেই সচ্চিদানন্দ চিন্ময় মূর্ত্তি কোন অবসাদের তমোগূঢ় অন্ধকারে মুছিয়া গিয়াছে। সেই যে বাঙ্গলা তাহার নিজের মাটীর পরিচয় ভুলিয়া গেল, সেই হইতেই এই দিনগুলা আঁধারেই কাটিতেছে। কিন্তু দীপের ধর্ম্মই জ্বলিয়া উঠা। আত্মার অন্তরের পরতে পরতে যে দীপ জ্বলিয়া আলোক বিকীরণ করে, সে আলোকের ধর্ম্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এই দীপের আলোয় মরিয়া যায়। সকল মানবই সেই পরিচয়লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সকলকেই একদিন সেই সাযুজ্য-পরিচয়ের জন্য আত্মার আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই হইবে। সেই মধুর পরিচয়টি করাইবার জন্য মাটী অহরহ সজাগ রহিয়াছে। তাহার

আর সে চেষ্টার বিরাম নাই, বিরতি নাই, বিশ্রাম নাই, সঙ্কোচ নাই। স্নেহময়ী জননীর মত সে তাহার জন্যই ব্যস্ত। তাই মাটী আমাদের শুধু শরীর দান করে না, আমাদের মন-প্রাণের নূতন জন্ম দিয়া নবজীবন দান করে। মাটী শুধু মাটী নহে। মাটীই আমার সঙ্গে অনন্ত রসমূর্ত্তিরূপে আমার প্রাণের সঙ্গে রসলীলাভঙ্গে একদিন সেই প্রাণমণি দীপখানি জ্বালাইয়া দেয়। সেই দীপ একদিন বাঙ্গলার কবিচিন্তামণির বুকের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণিকোটায় জ্বলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক মুসলমানযুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ এই ফেরঙ্গ-যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গলার গানের জন্ম। আজ আপনাদের আমি সেই বাঙ্গলার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান, সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই কথা কহিব।

আমার বাঙ্গলার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত' কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গলার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যামচেলাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মার বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্ম্মি-বিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত হলহলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জ্জটী, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম; আকাশ উজ্জ্বল, তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কল-ঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলনা আছে! সেই বাঙ্গলা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ; সে বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয়, সেই আনন্দে, আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চন-মণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়ির চাপ ও ধূলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস পরিয়াছি। বাঙ্গলা ভুলিয়া বাঙ্গলার ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া সে মায়ের রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। চোখে পর্দা পড়িয়া গেছে, চোখ খারাপ হইয়া গেছে। আজি চোখের সম্মুখে ইউরোপীয় অবভাসের যবনিকা—চোখ আর সে রূপ চিনিতে পারে না। ইউরোপীয় ভাবের ধারায় ছাঁচে, নিজেদের না ঢালিয়া, আমরা যেন আজ কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভাব ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন

ও ধর্ম্মের অঙ্গে আজ এই ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন ধর্ম্ম সাহিত্য শিল্প ও সব কল্পকলাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই ফেরঙ্গ বাঙ্গলার ফেরঙ্গ সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী-ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম; সেই পদ্মালয়া, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সেই সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী রুধিরার্দ্র-বসনা করালী—আর দেখিলাম সেই মদনমোহন,—

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

সে যুগলরূপের কি ওর আছে! আধশ্যাম, আধরাধা যেন মেঘ-অঙ্গে বিজলী মিলাইতে চায়; মেঘ যেন বিজলীর ঝলক দিয়া হাসিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপ ফুটিয়া উঠিতে চায়, সকল রূপ প্রতিনিম্বিবেই সেই যুগলরূপে মিলাইয়া যায়।

'মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ
চকোর পাওল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥'

আর বাঙ্গালীর কবি চণ্ডিদাস সেই রূপের পাশে রহিয়া, ভাবে গদ গদ হইয়া,

"চামর ঢুলায়ত।"

এই ছবি বাঙ্গলার নিজস্ব। যে মরম জানে, সে রসিক এই রসের কথাও জানে। সেই প্রাণের ধারার সঙ্গে সাধনাঙ্গের ধারার পরিচয় রামপ্রসাদেরও ছিল। রামপ্রসাদ তাই গাইয়াছিলেন,—

"গিরিবর আর পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে।"

এ সব গান বাঙ্গলার প্রাণের পঞ্জর হইতে বাহির হইয়াছে, জীবনের সঙ্গে এ রসের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আজ বাঙ্গলা সেই প্রাণের প্রাণকে তাহার সাহিত্যের—তাহার জীবনের সেই রূপ, যে রূপের চরণে,—

"মদন মূরছা পায়,"

সেই রূপ ভুলিয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। নিজেদের বাঁচার মত বাঁচিতে হইবে। শুধু একটা কাব্যের খাঁচা দেখাইয়া, রসবোধের রসিক হইয়াছি বলিলে, প্রাণ বুঝে না। আত্মায় আত্মায় রমণে সে রস উপভোগ হয় না। মনুষ্যজীবনের যে চরম পরিচয়, তাহার পথে শুধু অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আসিয়া ব্যবধান করিয়া দাঁড়ায়। তাই এই মিথ্যাময় ফেরঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গলার জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে। আজ তাহারি বার্ত্তা আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আমি প্রাণে প্রাণে যে অনুভূতি দ্বারা—সাধনের দ্বারা জীবনের সে রূপের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গলাকে তাহা শুনাইবার জন্য আমি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। আজ এই তমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয় আমাদের জীবনের ধারাকে বাঁচাইতে হইবে। এই ভাবের অপচারের দিনে, ফেরঙ্গ-সাহিত্য ও জীবনের দিনে সমগ্র শক্তিকে একবার অন্তর্মুখী করিয়া বাঙ্গলার সেই প্রাণের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গলার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর। দেবতা চায় অমৃত, অসুরে চায় অনৃত। মানুষের এই দেহ-মন-প্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রয়ের ভিতর অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিয়াছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার, মহতো ভীতি হইতে নিজেদের বাঁচিবার জন্য বাঙ্গলার সবুজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দিনের আলোকে নিজেদের সন্ধান করিতে হইবে, তবে সেই অমৃতে আমাদেরই অধিকার। বাঙ্গলার সশক্তিক কবি চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের, বাঙ্গলার স্বধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রসসৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণের জিনিষকে তাঁহারা যেমন বুকের ভিতরে প্রাণ ভরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সাধনের পথে—সেই অনুপম কাব্যসৃষ্টির পথে নিজেদের ও দেশের গতিকে লইয়া যাও, নিজের জীবনে ও কর্ম্মে মিলাও, তোমার নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ-জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। স্বধর্ম্মের—বাঙ্গলার প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মের এই পরিচয় পাইলে;

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,'

নচেৎ সারা বিশ্ব উজাড় করিয়া বিশ্বের কাব্যভার মাথায় কবিয়া আনিয়া, নিজের ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তাশক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, মনকে চোখ ঠারিয়া, যাহা কিছুই রচনা কর না কেন, বেলাভূমে বালুর প্রাসাদের মত এক বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, তাহার রেখাও থাকিবে না, কোন চিহ্নও পাইবে না। তাই আজ দিন থাকিতে থাকিতে ফিরিতে বলিতেছি। এ ব্যাধির যে ঔষধ, তাহা ওষধি-লতার মত বাঙ্গলারই বনে জ্বলিতেছে।

আজিকার দিনে এই জীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে, এই ব্যর্থকাম বৈদেশিক খোলসপরা জীবন ও কল্পরাজ্যে যে শ্রীরামপুরী খৃশ্চান পাদরীর নৈতিক সভ্যতা ও পাপবোধের অপচার মিলাইয়া, আজ শতবৎসর ধরিয়া, জীবন ও সাহিত্যের নামের, জীবনের বিচিত্রতার নামে, ধর্ম্মের নামে যে পুঞ্জীভূত ধূলা, পুঞ্জীভূত অধর্ম্ম, ক্রীতদাসের পরানুকরণ,—জীবনে ও সাহিত্যের, কর্ম্মের ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে ছাপ পড়িয়াছে; গানে, সুরে, চিত্রে, স্থাপত্যে যে ক্লেদ, যে পঙ্ক, যে ধূলী, যে খড়ি-মাটীর রং পড়িয়াছে, তাহাকে মুছিতে হইবে; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মনুষ্যত্বে ভাবের দাসত্ব, ভাষার দাসত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া আর কোন পথ নাই,—নাই। তাই সেই জীবন ও ধর্ম্মের, প্রাণ ও সাহিত্যের মাঝে বাঙ্গলার সেই চিরন্তন বাণীকে তোমাদের কাছে, সাহিত্যের মধুর বিচিত্ররূপের ভিতর দিয়া আনিয়া দিতেছি; গ্রহণ কর!—গ্রহণ কর! ইহাকে বৈষ্ণব-তত্ত্ব বা রসের কথা বলিয়া, তত্ত্বের কথা না জানিয়া, রসের কথা না বুঝিয়া ফেলিয়া দিও না। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ইহা বাঙ্গলার মাটীর ও প্রাণের মিলন-ভূমি; এই কাব্যলোকেই বাঙ্গলার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মনে করিও না, তোমরা আজ যাহাকে বিচিত্র হওয়া বলিতেছ—তাহা সত্যসত্যই বাঙ্গলার স্বাভাবিক বিচিত্রতা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া, সেই কথাগুলিই রসান দিয়া, বাঙ্গলায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংঘাতজনিত শতখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্ব ভাবে বিচিত্র হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণ-ধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাব-মোহ এই "বিশ্ব"-মোহ যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে, নাড়ীচক্রকে ব্যাধিপীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হইবে। বাঙ্গলার নিজের প্রাণকে জানাই তাহার একমাত্র উপায়। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, সাহিত্য ও জীবনকে আমি চণ্ডিদাসের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাই, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। তাহা নয়; নদীস্রোত উল্টা ফিরিয়া যায় না, সে আপনার পথ আপনি কাটিয়া লয়। সৃষ্টির বীজ অন্তরেই নিহিত থাকে, আঁখির আগে আগেই রূপে ধরা দেয়, পিছনে নয়। বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে—চণ্ডিদাসের গানের মত স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গলার স্বাভাবিকতা

ফরাসী রুশের Naturilism নহে। এ স্বাভাবিকতায় প্রকৃতি ও আত্মা আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে। তাই সেই যুগের প্রাণময় প্রাণের সুরে ঢালাই করা গানের ধারা ও উৎসের খোঁজ করিতে চাই। আশা করা যায় যে, বাঙ্গলার সেই কাব্যসাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার, তাহার জীবনকে সত্য করিবার পথ আবার আমরা সাধন করিব এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবই করিব ও তাহার সেই উৎসের মূল রসের পথ ধরিয়া সেই নিখিল রসের সকল আনন্দের মাঝে, আমাদের বাঙ্গালীজাতির জীবনের সার্থকতা অনুভব করিব।

কেহ কেহ বলেন, বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশ পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন। এই পরাধীনতায় তাহার অনেক মানুষী-বৃত্তিও অনুশীলন অভাবে নষ্ট হইয়া গেছে। স্বাধীনতার যে আনন্দ, জাতীয়তার যে সংবিৎ, যে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, তাহাই নাকি কল্পকলার প্রাণ। এই স্বাধীনতাই তাহার বিরাট্ উপায় ও ফল। ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, বাঙ্গলা তাহার এই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা হইতে বিচ্যুত হইয়া, তাহার জীবনের সরল গতি হারাইয়া, সত্য সুন্দর শিবের ধ্যান ভুলিয়া গেছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাঙ্গলায় সাংখ্যকার কপিলের জন্ম, এই বাঙ্গলাই শ্রীচৈতন্যকে দিয়াছে, এই বাঙ্গলাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছে। এই বাঙ্গলাই একদিন সমস্ত প্রাচ্যকে ভাবে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে অজেয় নেতার মত চালাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার স্বাধীনতা—তাহার আত্মার আত্মস্থ-সংবিতের অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। এই অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মার জীবন্ত রসানুভূতির জন্য বাঙ্গলা যে তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপস্যাই কত বিচিত্ররূপে বাঙ্গলার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার সাধনা, বাঙ্গলার স্বাধীনতার আদর্শ সেইখানে, বাঙ্গলার কল্পকলার ভিত্তিও সেইখানেই। সেইখানেই আমাদের গীতিকবিতার ও গানের প্রাণ।

মনুষ্যজীবনের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কখন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় হয় নাই,—হইবেও না। শুধু পরের দাসত্বের বোঝা ও শিকল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাতে জীবনের স্বাধীনতা-রক্ষা হয় না। মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তির, সকল রসের অনুভূতির, সকল যাতনার উপরে, সকল ভোগের উপরে, নিজেকে—নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, স্বাধীনতা অর্থহীন দেহভোগীর প্রাণহীন বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার আত্মার সংবিতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন, সে যুগও বাঙ্গলার স্বাধীনতার যুগ নয়; কিন্তু দারিদ্র্যের—পরাধীনতার—সমাজের সঙ্কীর্ণতার সমস্ত সঙ্কোচ ও ব্যবধানের মধ্যেই তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে দারিদ্র্য, পরাধীনতা, সমাজের পেষণ কিছুতেই পাড়িতে পারে নাই। এই সব

মহাপুরুষদের প্রাণ-বেদীমূলে মাটী যে সমিদ্‌ভার আহরণ করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারা একনিষ্ঠ সাধকের ধারায় নিজেদের মাটীর সম্পর্ককে এক করিয়া, সে প্রেমাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। কোন সমাজসংহিতা, কোনরূপ দণ্ড তাঁহাদের এই জ্বলন্ত জীবন্ত অগ্নিশিখা নিভাইতে পারে নাই। আত্মার সেই প্রেমরসের অনন্ত বিভূতি, এই পরাধীনতার ভিতর হইতেই তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রেমের সৌভরাজ্যে তাঁহারা চিরনূতন সম্রাট্‌; কেমন করিয়া অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের জীবন্ত প্রেমভরা মণিকোঠায় পৌঁছিয়া, সেই রসচিন্তামণি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই সাযুজ্য-পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার—উপলব্ধি করিবার বিষয়।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য "রূপক"। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। রূপ-অরূপের প্রভেদ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ, বস্তু ও অবস্তুর প্রভেদ শুধু বিচারদ্বারা কতদূর বুঝা যায়, বলিতে পারি না। শুধু বিচার-বুদ্ধির উপরে আমার সেরূপ আস্থা নাই। খুব সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত সত্য-মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া, সেই সত্য-মিথ্যার সাগরসঙ্গমে দাঁড়াইলে গঙ্গাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সাগরও দেখিতে পাওয়া যায় না। মায়া বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়াধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দ্বারা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না, মায়াও আপনার প্রকৃতরূপে দেখা দেয় না। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া, সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণবকবিতা বুঝিতে গেলে, বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের সে সাধনা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সাধনা। বৈষ্ণবকবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই; সেই প্রাণকে যে জানে না, জানিবার চেষ্টাও করে না, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? বৈষ্ণবকবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মের শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলরূপই বাঙ্গলার সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণ, যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্বলীলার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কৃষ্ণ যদি বাস্তবিকই কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, তবে ত এ জীবনকে ধন্য মনে করি। কৃষ্ণ

বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ-বৈচিত্র্যে ভরা-ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে, মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার, তাহাকে দুর করিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গলাদেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। বাঙ্গলা যে প্রাণে প্রাণে বৈষ্ণব। বাঙ্গলার যে স্বাভাবিক শক্তি, তাহারই তপস্যা করিতে হইবে। তোমাদের ইহাই বলিতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ রূপক নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারতসভ্যতার ইতিহাসে, হিন্দুর জাতীয় গরিমার ইতিহাসে, তাঁহার স্থান অতি-অতি-ঊর্দ্ধে, সেই আদর্শ মহাপুরুষকে শ্রীভগবান্ বলিয়া ভারত-আপামরসাধারণ মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া ভারতে সমাজ, ধর্ম্ম, সত্যতা অঙ্গাঙ্গি-যোগে যুক্ত,—তাঁহারই লীলার মহাভাবে পুষ্ট ভারতের কাছে ইহা রূপক নয়, বাঙ্গলার কাছে ইহা রূপক নয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু ঐতিহাসিক নয়, যুগে যুগে মহাপ্রাণের ভিতর সেই লীলা-আভাস-চঞ্চল মূর্ত্তিতে বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষ মুখরিত ও বিকসিত। যাহা জাতির প্রাণের ভিতর দিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ইহলোক-পরলোককে ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া লইয়া আসিতেছে, তাহাকে রূপক বলিয়া, রকম করিয়া, পাশ্চাত্যের রূপক লইয়া, এত মাতামাতি করিলে চলিবে কেন? চটুলতায় কোন অধ্যাত্মসাধন হয় না। যাঁহারা দেশের দশকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ-সাধনা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায় প্রতি ভাবে প্রতি কার্য্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহারা সংসারে জন্ম লইয়া নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলনা করে, যে আলোক তপস্যার দ্বারা প্রাণের পরতে পরতে ঝলকিয়া উঠে, আত্মার সে স্বানুভূতি যাহাদের নাই, যাহাদের জীবনটা নিজেদের কাছেই রূপক, তাহাদিগকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই; শুধু এইটুকুমাত্র যে, আপনার আত্মার পথ ধরিয়া বাঙ্গলার নবজীবন-উষার প্রাক্কালে, নবোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেশের সাধনার ধারার মধ্য দিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, আপনার কল্যাণের পানে মুখ তুলিয়া, মন মুখ এক কর; তবে বাঙ্গলার আত্মস্থ সাধনার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের মধ্যে, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালবাসা, মিলন, বিরহ, সমাজের সহিত বিরোধ, প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রচলিত আচার, অনাচার, তান্ত্রিক-আচারের সঙ্গে বিরোধ ও মিলন, স্বাভাবিক হইবার—সহজ হইবার

যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারি কথা—এই বাঙ্গলা কবিতার ভিতর হইতে আমি দেখাইতে চাই। যে সকল কল্লকলার ধারায় এই বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ, এই চণ্ডিদাসের ও রামপ্রসাদের গান বাঙ্গলার সেই কল্লকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছে। আজ এই ইউরোপীয় অবভাসের দিনে আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার ঘরে সে দীপ আবার জ্বলিয়াছে। জানিও, ইহাই বাঙ্গলার অভয়-বাণী। এই বাণীকে সত্য ও সার্থক করিতে হইবে।

আর একটা কথাও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বড় বেশী। আধুনিক কবিতা আর এখন instinct এর (স্ব-স্বভাবের) পর্য্যায়ে নাই; তাহা এখন ঊর্দ্ধগ, অতীন্দ্রিয়ের সুবাসে মত্ত। ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সত্তা, আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয়ও যাঁহাব সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাঁথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি? রক্ত-মাংসকে, মাটীকে অস্বীকার করিয়া, মানুষের সাধ-সোহাগ অস্বীকার করিয়া, কাব্যলোকে কোন শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আধুনিক নকল ইংরাজী-নবীশদের বুদ্ধির বায়নাক্কায় পড়িয়া, বহুকাল হ-য-ব-র-ল হইয়াছে। তাই এখন শুনিতে হইতেছে যে, বৈষ্ণব কবিতা erotic। বাঙ্গলার সাধনা চিরকালই ইন্দ্রিয়কে সত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের সকল রস আহরণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের মুখে বল্গা দিয়া চালাইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সকল বৈচিত্র্যের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দিয়া, তাহাদের সকল বিভিন্নতাকে সে এক করিয়াছে। বহুর মধ্যে, বহু বিচিত্র রসের মধ্যে বাঙ্গলা সমরসের আস্বাদন করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙ্গলা কখন অস্বীকার করে নাই। বৈষ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণে, দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছে, সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ-রস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধা, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবত-ভোগের ইন্দ্রিয়। বাঙ্গলার কবি সাধক, সেই ভোগে আত্মস্থ শুদ্ধির মধ্যে ভুক্তিকে সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় রমণ করে,—এ ভোগ ভাগবত-ভোগ। বাঙ্গলার গীতিকবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃশ্চান পাদরীর কাছে বাঙ্গলার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা ও পাপরোধের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদের আদর্শ ভুলিয়া, প্রতীচ্যের রঙিন খোলসে পড়িয়া, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করিয়া, সাহিত্য ও ধর্ম্মে আত্মহত্যার গৌরব অর্জ্জন করিব?

আজিকালিকার দিনেও এ সব অলীক খৃস্টানী নীতিকথার ন্যাকামীতে যাহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, তাহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। বাঙ্গলার বুকের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেছে; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচার—সমাজরক্ষার নামে হিংসার অত্যাচার—বিজাতীয় অত্যাচার—মানুষের উপর মানুষ যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, সব হইয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার রূপ, কত রঙের বিচিত্রতায় বদল হইয়া গিয়াছে। কত কবি জন্মিয়াছে, কত অকবি জন্মিয়াছে; গত কয় শতাব্দীর উপর দিয়া কত ঝঞ্জা, কত ব্যাত্যা, কত বিরোধ ও বিদ্রোহের অগ্নিতে সমাজ, মানুষ ও ধর্ম্মের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও আলোড়ন হইয়াছে; কিন্তু তাহারই মধ্যে বাঙ্গলার যে শান্তি, পর্ণকুটীরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি—সে সামর্থ্য হারাইল কেন? সে আদর্শ কেমন করিয়া এই ফেরঙ্গ-যুগ নষ্ট করিল, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডিদাস যে ব্রজপ্রদীপের প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, সেই প্রদীপ আবার জ্বালাইতে হইবে। কত বিপদ্, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডিদাস ও শ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া বাঙ্গলার পরিপূর্ণ রসমূর্ত্তিটিকে নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই কথাটি—সেই পথটি আমাদের বিশেষরূপে ভাবিবার ও দেখিবার বিষয়; সে বিষয়ে অন্যমত থাকিতেই পারে না। সেই পথ না জানিলে দেশের সাহিত্যের ধারাকে আমরা কখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না। সেই ধারা সরস্বতীর ধারার মত বালুর নিম্নে কোথায় লুকাইয়া আছে। তাই আজ সাহিত্যের কাননে মুঞ্জরিত তরু নাই। তাল-তমাল-রসাল-পিয়ালের সে বনশোভা নাই, অশ্বত্থ-বটবৃক্ষ নাই, সপ্তপর্ণ নাই। তাই এখন পোড়া বাঙ্গলা শুষ্ক ধনভূমিতে পুঞ্জীকৃত "এরণ্ডোৎপি দ্রুমায়তে।" বালুর নিম্ন হইতে আমরা সরস্বতীকে আবার বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করিব।

আজ কেন তাহা নিভিল? এর কারণ খুঁজিয়া দেখিলে, অবশ্য একেবারে তার কোন নির্দ্দেশই পাওয়া যায় না, এমন কথা নয়। সংসারের প্রত্যেক কারণ ও কার্য্য জড়াইয়া এত বিচিত্রতায় পরিণত হয় যে, অনেক সময় সেই আসল কারণটার কোন নিরাকরণই হয় না। আমাদের এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই, এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করিবেন; তবে সকলের চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমরা আমাদের প্রকৃতিকে হারাইয়াছি। কেমন করিয়া যে তাহা হারাইলাম, তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিবে। সে কারণ অনুসন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা আমাদের ভুলিয়াছি। সিংহ যদি একবার নিজের মুখখানা তার প্রাণের আয়নায় মর্ম্মের আলোকরশ্মিতে দেখিতে পায়, তবেই সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যায়।

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তাহাই। নিজেকেসিংহরূপে চেনা চাই—সাহিত্যের ও কাব্যের চরম কথাও তাই—আপনাকে চেনা চাই।

সেই চেনার ভিতর—সেই প্রাণের মরম-পরিচয়ের ভিতর—যত কথা সব লুকাইয়া থাকে, সেইখানেই যত খেলা। এই প্রাণ-মন-দেহ, এই প্রতিষ্ঠাত্রয় দিয়া নিজকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলে, এই যে আমার মৃণ্ময় ভাণ্ডটি মুহূর্ত্তেই চিন্ময় হইয়া উঠে। মানুষ আত্মস্থ হয়, এই আত্মস্থ অবস্থাই চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদের হইয়াছিল। এই জাগ্রত জীবনের খেলাই তিনি কৃষ্ণলীলার ভিতর দিয়া নিজের প্রাণের মহামিলন-পরিচয়ের মুহূর্ত্তগুলি গানে সুরে সৃষ্টি করিয়া গেছেন। আধুনিক কবিদের মত নিজের প্রাণের সঙ্গে কোন পরিচয় না রাখিয়া, শক্তিহীন সমালোচনার তরঙ্গ-ভঙ্গের ভাবুকতায় হাবুডুবু খাইয়া, শুধু কেবল বালুতটে ফেনা ছড়াইয়া, কীর্ত্তির ফেনা রঙ্গিন করিয়া যান নাই। আধুনিক কবিরা আত্মাকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া, প্রেমের মধুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সকল রসের—সকল রূপের সঙ্গে প্রাণমনে সবিকল্প পরিচয় করিয়া আত্মায় আত্মায় রমণে যে আনন্দ, তাহা আস্বাদ করিতে পারেন নাই। প্রাণ সাগরের ওপারে সেই আনন্দলোকে—তাহার কাছেও পঁহুছাইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সমুদ্রপারের তীর হইতে শুকনা সমুদ্র-ফেনা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বোঝা ভার করিয়াছেন।

তাই আজ ডাক দিয়া বলিতেছি, হে আমার বাঙ্গলা, আপনাকে চিনিবার সুযোগ আপনিইত হইয়াছে। আত্মা-অশ্বে বল্‌গা দিয়া, এ জীবন-রথকে চালাও, জয় অবশ্যম্ভবী। আজ তোমার ইহাই পথ, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই!—নাই!

আজিকার এই সাহিত্যের দরবারে আমি পুরান কথাটিই আবার বলিতে আসিয়াছি। গীতি-কবিতা কি? গান কি? গীতি-কবিতার প্রাণই বা কি? গানের প্রাণই বা কি? কেননা, বাঙ্গলা দেশে যাহাকে পদাবলী-সাহিত্য বলা হয় বা তাহার পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলগুলিই সুরে গান হয়। আমাদের গান ও বিলাতী গীতি-কবিতায় কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য না বুঝিলে দেশের প্রাণের সঙ্গে ঠিক পরিচয়লাভ হইবে না।

বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন। তাহাই প্রাণের ভাব-রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজস্বের ছাপ দিয়া দেন। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়। যে কবির আত্মায় সমস্ত বিশ্বের এই রূপ প্রতিভাত হয়, আর তাহা কবির মনের রূপের ছাঁচে গড়িয়া উঠে, সেই কবির কার্য্যই এই গীতি-কবিতা; কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।

আমাদের দেশে চণ্ডিদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন। সেই আনন্দের সুরের রসে সব কথাগুলি ভিজান। মানুষের যে প্রাণের প্রকৃতি, সে যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া স্বাভাবিকভাবে পাখীর গান গাওয়ার মত গলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই হইল—বাঙ্গলা গীতি-কবিতার বা গানের প্রাণ। সেই জন্য আমি বলিতে চাই, বাঙ্গলার প্রাণের ভিতর হইতে গানই বাহির হইয়াছিল, ইংরাজী গীতি-কবিতা হয় নাই। ইংরাজী-প্রমুখ যে বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে, তাহারই ফল এই:বিলাতী গীতি-কবিতা। এ ধারা বাঙ্গলার নিজস্ব নয়। মনকে, চক্ষুকে, প্রাণকে ঠিক ঐ বৈদেশিক শিক্ষার ছাঁচের ভিতর দিয়া না লইয়া গেলে, ও গীতি-কবিতার ধারা সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর। গীতি-কবিতায় থাকা চাই,—তাহার ভাবের একাত্ম-রস আর সেই রসের একটি পরিপূর্ণস্বরূপ ফুটাইয়া তুলাই তাহার কাজ। যেখানে সেই রস খুব গাঢ় ও খুব অল্প কথা বা ভাবের দ্রুতকম্পনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবে, সেইখানে গীতি-কবিতার সার্থকতা। সেই ভাবের ও রস-সৃষ্টির মুহূর্ত্তে যখন কবি তাঁহার নিজের আত্মায় প্রতি-ফলিত আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনি তাহা রূপান্তরে পরিণত হয়। আমরা আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই জিনিষটি পাই না ; এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু গান যখন আসে, তখন সুর আসে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কথা, শুধু সেই রূপকের—সুরের সেই রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। সেইখানে সুরের সঙ্গে রসিক কবির আত্মার স্বানুভূতি জাগে, পরস্পর নিজের মাধুরী আস্বাদন করে, তাহাতেই সুর ও কথা আপনিই আসে। যে গান রসের সৃষ্টমূর্ত্তিকে সুরের রূপে ঢালাই করিয়া দেয়, সেই গানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি। ইংরাজী গীতি-কবিতায় ভাবের যে দোলন বা গতি প্রকাশ পায়, তাহা প্রায় অধিকাংশই কবির মনের গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গলা গান তাহা নয়, তাহার গতি আত্মার আপনার নিজস্ব। তাহার সুরের ও ভাবের মাদকতা জাগে, সেই উন্মত্ততায় সে গানের ধারা সৃষ্টি করে। ইহাই সেই 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী'। আমাদের দেশের মেয়েলী-ছড়া, গাথাকে গীতি-কবিতার স্তরে ফেলা যাইতে পারে বটে, তবে তাহার ছাঁচও বস্তুর নিজের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির প্রাণের ছাপ নাই, বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় সরস থাকে। এই বিলাতী গীতি-কবিতার আমদানীতে আমরা ঠিক নিজেদের রাখিতে পারি নাই। আমাদের আত্মস্থ হইবার পথে, এই পথ—এই ছাঁচ প্রকাণ্ড অন্তরায়। কেন না, বস্তুর সহিত ইহা আমাদের সম্যক্ পরিচয় করাইয়া দেয় না। একটা কুহেলিকাময় আবরণের ভিতর আমাদের যে নিশ্বাস, তাহা রুদ্ধ হইয়া আসে। এই যে ভাব, ইহা সত্যও নয়, অসত্যও নয়,

জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, এই এক অদ্ভুত অবস্থায় আধুনিক গীতি-কবিতা দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মাটীর রসের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের দেহের ও মনের রসের একটা অন্তরের মিল আছে। সেই রসের টানে, সেই রসের আবেশে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার দেশের প্রাণের পরিষ্কার নিখুঁত পরিচয় করাইয়া দেয়। বিলাতী Lyricএর আর একটা দিক্ আছে, তাহাতে অনন্তের দিক্ দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু অনন্ত দুইটা হয় না; আপনাকেও দেখাইব, অনন্তকেও দেখাইব, তাহা হয় না। কল্পনা যেখানে মূক, মানুষ সহজেই সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। একটা কোন স্বচ্ছন্দ পরিষ্কার প্রাণের অনুভূতির কোন রেখাও পড়ে না; কোন রূপের দ্বারাও প্রকাশ করিতে পারে না। বাঙ্গলার কবিতায় চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের যুগে, কি কবিওয়ালাদের সময়েও এ ভাব তাঁহারা তাঁহাদের গানে কখনও আনেন নাই। তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই।

তাই সেই বাঙ্গলার গান মানুষের জীবনের ধারায় সাধনের পথে আত্মার প্রতিধ্বনি; সে যেন রাগে সুরে মাখামাখি করিয়া তন্ময় হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আবার সেই আত্মার গভীর নিগম দেশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাবগুলাকে গলাইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেন গলিয়া রস-নির্ঝর ধারায় ঝরিয়া পড়ে। তাহাই আবার সুরের রঙে, ভাবের রঙে রঙিন হইয়া, এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করে সেই ধ্যান লোকেই কাব্যলোকের রূপান্তরের অনুভূতি হয়।

প্রথম কথা, আদর্শ কি? কাহাকে বলে? আদর্শ সেই পরিপূর্ণ রসের আকর লীলামৃত সুন্দর অনন্তশক্তির আধার শ্রীভগবান্। তিনি নিজেতে নিজেই অধিষ্ঠিত—স্বাধীন, সেই জন্য অনন্ত। লীলার মধ্যে যিনি বিশৃঙ্খলাকেও সুশৃঙ্খলায় লইয়া আসেন, সেই চিদ্ঘন-আনন্দ-সুন্দর পুরুষ, জড় ও জীবের যিনি আশ্রয়, লতা-গুল্ম, পশুজীবন, মানবজীবন, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্যলোক, মহাব্যোমে অনন্ত-কোটী নক্ষত্র-রাজী যাঁহার খেলার বুদ্বুদ্, যিনি প্রতিরূপেই স্বপ্রকাশ, তিনিই এই বিশ্বের আদর্শ। তিনিই সুন্দর, তিনিই কল্যাণ, তাঁহার সৃষ্ট, অনন্ত রূপই সুন্দর এবং সব সৃষ্টিই সেই জন্য সুন্দর। যেখানেই তাঁহার সুন্দররূপের প্রকাশ হয়, সেখানেই উজ্জ্বল বিভার আলোকচ্ছটায় সৌন্দর্য্য শতগুণেই ফুটিয়া উঠে। স্বপ্রকাশ স্বাধীন আত্মার যে অনুভূতি ও সৃষ্টি, তাহাই কল্পকলার রূপসৃষ্টি। আর যে রূপে অনুভূতির আদর্শ ও রূপে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে পূর্ণ সরস হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। সেই মুহূর্ত্তেই আমরা চিদানন্দ-ঘন-রসের স্ফূর্ত্তি যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য্য সেই জন্য সকল রকমের স্বাধীনতার উপরই ফুটে। জীবনের সাধনার ধারায় যখন মন-প্রাণ-দেহের সর্ব্ববাধা-বন্ধনবিহীন ভাবে ও আবেগে অনন্তের দিকে মুখ তুলিয়া চায়।

প্রাণের ভিতর সেই অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাঙ্গীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহ-কারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর—চণ্ডিদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির-অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন-রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিল। এই রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই যে মানুষের জীবনের ধারায় সাধনাঙ্গের একটা সহজ দিক্ আছে, সেই রূপের পর রূপের অবিরাম রূপস্রোতের অনুভূতি ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিয়া ফেলে;—অমনি রূপের আসল রূপ ধরা যায়।

বাঙ্গলাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কারুকলার ধারা, যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না, বাঙ্গলা দেশ সাধন-ধর্ম্মের উপরই সকল কর্ম্মের—সকল সৃষ্টির—সকল কারুকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ঐ রূপের মধ্যেই চিত্রে, সুরে, কথায় নানারূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ-সৃষ্টি। এমনি করিয়া রূপের পরে রূপ, মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি, স্রোতের মত লীলাচঞ্চল বারিধি-বুকে লহরে লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলাতরঙ্গের যে দোলন-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলামৃতের মধ্যে রস-রেখায় রসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু; আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জয়নি-জয়নি' আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়া এই রস-সাধন করিতেছি। সেই রস-সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কারুকলার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাঙ্গলা দেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত চিত্রের ধারায় বাঙ্গলা দেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দের জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল,

নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রাত গৃহেই ভক্তের ভগবান্ অধিষ্ঠান করিলেন। প্রতি গৃহই গোবিন্দের মন্দির হইয়া উঠিল। সে অমিয়ভরা হরিধ্বনি মুসলমান-সভ্যতার ছাঁচকে বদল করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করুন, দেখিবেন—আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কি না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণন পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতেই বৈষ্ণব-পদাবলীর সে রসচিত্রের ও সুরের খেলা নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা Ideal কি Real, তাহার বিচার করিতে পারেন কি ?

"একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
'কে রে' 'কে রে' বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বোলেন, 'প্রভুর বাড়ী যাই॥'
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে কিবা নাম তোর ?
নিত্যানন্দ বোলে অবধূত নাম মোর॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মত্তপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পরে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সোঙরে॥
দয়া হইল জগাইয়ের রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল দুই হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরি মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় বড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥
আথে ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥

নিত্যানন্দ-অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে ॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে।
চক্র! চক্র! চক্র! প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥
আথে ব্যাথে চক্র আসি উৎপন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে না দেখিল ॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥
মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই ॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥”

এই যে বৈষ্ণবের শক্তি ও প্রেমের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই প্রেম-ধর্ম্মের স্রোতে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সাহিত্য-কল্পকলা গঠিত হইয়াছিল; তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই যে চরিত-চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? Realism না Idealism এর কল্পকলা? আমি বলিব এই যে, অভিনব রূপ ও চরিত্র-সৃষ্টি, ইহা বাঙ্গলায়ই সম্ভব, কেননা, ইহা বাঙ্গলায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য। সেই সত্যের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস অতি নিখুঁত তুলিকায় সংযমের সহিত তাহার সমস্ত ভাবটি ও চিত্রটি একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। যখন দরদরধারে রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে, তখনও সেই দুই জনের মাঝে দাঁড়াইয়া ‘মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর’, ইহাতে কি প্রেমের জাগ্রত রূপান্তর হয় নাই? ভগবান্ আমাদের দুই হাত দিয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, আমরা কত রকমের খেলাই তাঁহার সঙ্গে খেলিতেছি। কত দুঃখই তাঁহাকে দিতেছি, তবুও প্রেমময় আয়—আবার সেই আয় বলিয়াই ডাকিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দের এ প্রেমলীলা কি ঠিক সেই শ্রীভগবানের আদর্শের অনুভূতির রসে সিঞ্চিত নয়? কোল দিয়া—মার খাইয়া, তেমনি হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতেছেন। নিত্যানন্দের জীবনে সাধনের ধারার যাহা রূপান্তর হইয়াছে, চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কল্পকলায় রস-সৃষ্টিতে সেই রূপান্তরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই রস-সাধনার ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট ফুটিয়াছে। সেই জীবনকে আদর্শ করিয়া, মহাপুরুষ-প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া, আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে চাহিয়াছে ও কেহ কেহ সেই রূপান্তরের পরিচয় ও জীবনের সাধনের ধারায় ও কল্পকলার ধারায় গীতিকবিতা ও গানের

সৃষ্টিতে বেশ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সকলেই সেই পরিপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টিতে পঁহুছিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের যে মধুর রসের সাধন, তাহার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই অপূর্ব্ব সখ্য, দাস্য, বাৎসল্যমিশ্রিত যে অকিঞ্চন সমরস, তাহা আর কোন সাহিত্যে নাই। এই রসসৃষ্টি পরবর্ত্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিরা সেই আদর্শেই নিজেরা সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত রূপলাবণ্য, তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর, তাঁহার সেই অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভার সংযম ও হৃদয়ে সমাহৃত অনুপম প্রেম, যে বন্যা বাঙ্গলায় আনিয়াছিল, সে ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবের ধারায় বাঙ্গলার সাঁধনার সঙ্গে এক অতি নিগূঢ় যোগ আছে। চণ্ডিদাস ও বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা তাহার এই রস-সাধনা এই সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বলোককে প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গলা তখন মৃদঙ্গের মেঘগুরুনিস্বনে ও হরিধ্বনিতে মুখরিত ছিল। পবনে গগনে সে দিগ্-দিগন্তে প্রেমের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া দিত। সেই মহাপ্রেমিক যখন মহাসমুদ্রের বুকে রূপের নৃত্য দেখিয়া, আপনাকে সেই সৌন্দর্য্য-রসসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বলে উদ্বেলিত মহাসাগরের মহাপ্রাণের সঙ্গে যখন একাত্ম হইয়া রূপের স্বরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে মিলাইয়া নির্ব্বিকল্প-মহামিলন লাভ করিয়াছিলেন,—সেই এক চন্দ্রমাশোভিতা নিশা! শ্রীভগবানের রূপের তৃষ্ণা কেমন রূপের ধারার ভিতর দিয়া রূপে রূপে মিলিত হইয়াছিল! সে লীলা, সে খেলা, সে প্রেমের অজেয় তুলনা, কোন দেশের সাহিত্যে মিলিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, এই রূপ, এ সুন্দরের হাসি, তাঁরি রূপ, তাঁরি হাসি, তাঁহারই এই উন্মাদনা, তাঁরই এই উন্মত্ততা, তাঁহারই এই আবেগ, তাঁরই এই আকুলতা। চন্দ্রমাও তাঁহার, আমিও তাঁহার, তিনিও তাঁহার। এ যে রূপে-রূপে মিলন—প্রাণে-প্রাণে মিলন। শ্রীনিত্যানন্দের এই যে উত্তম অধম বিচার না করিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার কাহিনী, বাঙ্গলার গানের একটা দিক্, বাঙ্গলার ধর্ম্মসাধনের একটা অঙ্গ, তাঁহার এই লীলায় লীলায়িত।

> "ভকতি রতনখনি, উড়াইয়া প্রেমমণি, নিজগুণ সোণায় মুড়িয়া।
> উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তারি ঠাঞি, দান করে জগত বেড়িয়া॥",

লোচনদাস গাইয়াছিলেন—

> "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।
> চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা, হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥"

এই যে অভিমানশূন্য বৈষ্ণবের প্রাণ, এই যে অযাচিত প্রেমদান, এ আদর্শ বাঙ্গলারই নিজের। নিত্যানন্দ অবধূত তাহারি জীবন্ত—জাগ্রত—রূপান্তরে মূর্ত্তপ্রকাশ ছিলেন।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, এই বৈষ্ণব-সাধনা বাঙ্গলার নিজের আত্মার অধ্যাত্মসাধন হইলেও, তাহার একটা গতি আমরা ধরিতে পারি। সকল শক্তির ধারাই এক। একবার করিয়া কূটস্থ, একবার করিয়া কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচ, আর একবার করিয়া সম্প্রসারণ। চণ্ডিদাসের জনমের পর যে ভাব, যে প্রেমের সাধন, তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল, আবার সম্প্রসারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। সেই ভাব বাঙ্গলাকে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে সকল রূপের সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, আবার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েই, বাঙ্গলার সকল সমৃদ্ধি ছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

তাহার পর একটা যুগ আলো ও অন্ধকারে কাটিল। শক্তি আবার কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচে পরিণত হইল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ, জাতির নানারূপ হীনতার মধ্যে মুসলমানের অত্যাচার, সব মিলিয়া দেশ আবার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল; নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের মাঝেই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর বাঙ্গলার কাব্যের ধারাকে অন্য দিকে পুষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার প্রাণের গানের সুর তখন মিলাইয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বরের শিবায়ন অনেকটা বাঙ্গলা যাত্রার পূর্ব্বাভাস বলিলেও বলা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন ও রামপ্রসাদের যে গান, তাহার তুলনা হয় না। বাঙ্গলা আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুসলমান-প্রভাবের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের জন্ম।

এই যে কাল ও কালধর্ম্ম, তাহার মধ্যে আমরা একটা সত্য ধরিতে পারিতেছি। বাঙ্গলার যে খাঁটি প্রাণ, বাঙ্গলার বাঙ্গালীজাতির যে বৈশিষ্ট্যের ধারা, তাহার প্রাণধারাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহারও একটা স্রোত চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মুসলমানী রাজার যে বিজাতীয় সভ্যতা, তাহার দ্বারা অভিষিক্ত যে ধারা, তাহাও চলিয়াছে। বাঙ্গালীজাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী জাতির অখাঁটি কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারার কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও, তাঁহার কাব্য সুন্দর হইলেও তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। রামপ্রসাদের ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য-সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় আছে। এক দিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে; কিন্তু দুই স্রোত গঙ্গা-যমুনার মত মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না। বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, বৈশিষ্ট্যই ভগবানের অভিপ্রেত। বিশেষেই রূপ সৃষ্ট হয়।

রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তনের প্রথমেই গাইলেন,—

"গিরিবর! আর পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহা সুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য-পুঞ্জচয়
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে॥"

এই বাৎসল্য-রসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গ-যুগে ঘোরো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। প্রথম ইহা সত্যই বাঙ্গলার নিতান্ত ঘরের ছবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরেরও ছবি। আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক্ দিয়া দেখিতে চাই।

গিরিরাণী মেনকা গিরিবরকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "ওগো, আমি যে আর উমাকে প্রবোধ দিতে পারি না", শুধু এই প্রথম ছত্রটি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহাতে রাণী মেনকার স্নেহ, বাৎসল্য, মধুর রসের যে বেদনা, তাহার স্বরেতে যে প্রতি অক্ষরেই মাখামাখি। তাহার পরের চিত্র সন্তানের অভীষ্ট বস্তু না পাওয়ার জন্য মেয়ের সেই অভিমান, ঠোঁট· ফুলাইয়া কান্না, স্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, এ সকল দিক্ কেমন অঙ্কিত জীবন্ত চিত্রের মত ফুটিয়াছে, সন্তান যেমন হাত বাড়াইয়া চাঁদের পানে চায় আর কাঁদে। এই কয়টি ছত্রের পর পুনর্ব্বার—

'আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে'

এইটা ফিরিয়া আর একবার বলায়, মার বেদনার গভীরতা কেমন ব্যক্ত হইয়াছে। তার পর,—'আয় আয়, মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে।'

এইখানে আমরা আর একটি নূতন রহস্য পাই, মেয়ে মা মা বলিয়া অঙ্গুলী ধরিয়া, যখন চাঁদের দিকে দেখায়, সেই হাত বাড়াইয়া দেখার ভিতর সেই ছোট মেয়েটির প্রাণের ভিতর যে রূপের ডাক, তার তৃষ্ণা, সেই পথে মিলিবার অজানিত আশা ও শব্দহীন ভাষা, তাহার ভিতর মেনকা রাণী তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা 'কোথা যেতে চায়', ইহা ভাবিয়া পাইলেন না। কোন্ অজানিত মহাশূন্যের পানে এই ছোট মেয়ের প্রাণ ধায় কেন, তাহা মেনকা নিজের মনে মনে ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'চাঁদ কি রে ধরা যায়' বলিলে, সে দুরন্ত মেয়ের মত বসন-ভূষণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মা মেনকা তখন যেন আর সামলাইতে পারিলেন না। পিতা গিরিবর উঠিয়া কন্যাকে ভুলাইলেন। মুকুরে মুখ দেখিয়া মা উমা তখন শান্ত হইল। তখন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

'জগজ্জননী যার ঘরে।'

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে পড়িল। শুধু মনে পড়িল নয়, জাতির জীবনের ধারায় যে পৌরাণিকী কল্পনা, আজও পর্য্যন্ত তাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই জগন্মাতার ভাবটিকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। এই যে বাৎসল্য-রসের ছবি, ইহা বাঙ্গলার ঘোরো রূপ হইলেও ইহার 'বিশ্ব'মোহ নাই। বাঙ্গলার জাত মারা যায় নাই। বাঙ্গলার সকল রং গঠন, হাব-ভাব সকলই আছে, অথচ কাব্যের, গানের যে প্রাণ, যেরূপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে। যখন পেটের মেয়ের মুখে বিশ্বমায়ের রূপ এমনি করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই রূপান্তর হয়।

আমি তুলনায় সমালোচনা করিতে চাই না। আমি আধুনিক বাৎসল্য-রসের একটি বাঙ্গলা কবিতায় প্রাণ এমনি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে চাই।

খোকা মায়ে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?
মা শুনে কন হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে !
ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি !
তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।
যৌবনেতে যখন হিয়া—
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে,
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে—
সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে,
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে,
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এ সকল ছত্রের ভিতর এবার আমরা দেখিব যে, বাৎসল্য-রস কেমন ফুটিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘোরো বাৎসল্য-রস নাই,—কিন্তু ঘোরাল রকমের রস আছে বটে। এখন দেখিতে চাই, এর কি রকম বাৎসল্য-রস ! মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে,—

'ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে।'

কোন খোকা আজও পর্য্যন্ত

'এলেম আমি কোথায় থেকে
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

বলিতে পারে কি না জানি না। ইহাতে কবি বোধ হয়, বুড়ো খোকার মত আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তাহার জবাবগুলিও মায়ের মুখে তাঁহার নিজের বুলি বসাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি, ইহা সেই বিলাতী ছাঁচে তৈরী। ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ৪এর শ্লোকে আছে,—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া গেছেন। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্কের চালনার দ্বারা এই ইচ্ছার স্থানে মায়ের মুখে প্রজাপতি ঋষির বাক্যটি বসাইয়া দেওয়া খুব সম্ভবও নয়। কেন না, বেদ তাহার পরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবিদ্যমা বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন—আশ্চর্য্য নয়!

বিশ্বমায়ের অন্তরের ভিতর মা হইবার ইচ্ছা অথবা মায়ের অন্তরের মা হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, এবং নারী তাহার নারী-জন্মের সংস্কারগত বুদ্ধিতে এ কথা মনে করিতে যে পারে, তাহা বলিতে পারেন। তবে তাহাকে এই ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম করিবার বুদ্ধি মায়ের মধ্যে থাকে কি?

তাহার পর কবি যতগুলি শ্লোক রচিয়াছেন, সবগুলির ভিতর কোন একটিতেও মার কথা নাই। মায়ের মুখের দার্শনিক কবির বুদ্ধির ভাষা ছন্দে গাঁথা। ইহাতে বাৎসল্য-রসের গভীরতা দূরে থাকুক, রসিকজন ইহাতে বুদ্ধির খেলাই দেখিতে পান, রসের কোন আভাসই পান না। যৌবনে মাতার অঙ্গে অঙ্গে সৌরভের মত মিলিয়া থাকা, নিত্যকালের পুরাতন হওয়া, জগতে স্বপ্ন হইতে এই আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আবার তাহার পর মায়ের খোকা রূপে ফুটিয়া উঠা একটা বুদ্ধির কারচুপি হইতে পারে, ইংরাজী সাহিত্যের ধারার বুদ্ধি-রস হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে বাৎসল্য রস বলে না। যে বাঙ্গালী সত্য পিতা হইয়াছে, যে বাঙ্গালী সত্য মাতা হইয়াছে, সে এমন করিয়া ভাবেও না, মনেও করে না। তারপর কবি ঐ কবিতার শেষে বলিতেছেন,—

জানিনে কোন মায়ার ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে!

এই শেষ কয় ছত্রে একটা সত্যই মায়ের প্রাণের ভাবের কথা বটে, তাহা অস্বীকার করি না, বিশ্বের ধন বলিয়া সন্তানকে মনে করা খুব অসম্ভবও নয়, তবে

কোন স্বাভাবিক মাতাই নিজের ছেলেকে 'বিশ্বের ধন' মনে করে না। 'জগতের সেরা মাণিক' মনে করিতে পারে, কিম্বা সন্তানের মুখে ভগবানের সৃষ্টিসম্পর্কের গূঢ় বাৎসল্য রস প্রাণে প্রাণে জানিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকাশ এরূপ নহে। ইহার আগাগোড়াই কবিতা নয়, রস নয়, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া কবিতার প্রাণ সৃষ্টি করিয়া তোলা। ইহা বাঙ্গালার গান, রাগিনী, কবিতা নয়;—তাই আবার বলিতে হয় যে, বুদ্ধিমান অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই ধরায় যে আমরা স্বর্গের কল্পনা ও আভাস পাই, পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছল ধারায় নিজেরা আর্দ্র হইয়া যাই, এমন করিয়া সেই গলাইয়া মজাইতে পারে শুধু প্রেম। প্রেমেই সেই সুরের ধ্যানে আমাদের এই সুখ-দুঃখ-সিঞ্চিত জীবনকে সত্য জীবন করিয়া তুলে। পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে সত্য বস্তু দেখি প্রেম—মানুষের প্রেম। রামপ্রসাদের গানে আমরা দেখাইয়াছি যে, এই মানুষের যে প্রেম, এই মানুষের যে বাৎসল্য, এই মানুষের যে মাতৃত্ব, তাহার সঙ্গে জগন্মাতার যে ভাব, সে সত্য অনুভূতি, রূপে, ভাষায়, সুরে রামপ্রসাদের গানে ফুটিয়াছে, তাহা এই আধুনিক শিশু কবিতার জন্মকথায় নাই, থাকিতেই পারে না। কেন না, মাতার প্রাণের পরিচয় ইহাতে নাই, আছে শুধু জ্ঞানের বোঝা তাহার দার্শনিক তত্ত্ব, মাতার যৌবনের সৌরভের স্মৃতি আর যে রহস্যের নিগূঢ় পরিচয় দিয়াছেন, সেই রহস্যের কথা।

'সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?'

এই যে রহস্যের ভিতর এক প্রশ্ন তুলিয়া খাড়া করা, এ রহস্য জগতের সকল রহস্যে মিলাইয়া দেখার মত ভাব, কবির নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুসন্ধানের পরিচয় হইতে পাবে, ইহাকে রহস্য-রস বলা যাইতে পারে। এত বিচার বিপত্তি মা'র হয় না। মাতা সন্তানের মুখে বিশ্বের সকল পরিচয়ই পাইতে পারেন ও বিশ্বের মধ্যে সন্তানের সকল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কগুলাও দেখিতে পারেন; কিন্তু তাহা এমন বিচার করা পর্দা-ঠিক-করা শুষ্ক জ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, সে মাধুর্য্য আর এক রসের ধারা। সেই রসেই বাঙ্গলার জাত বজায় থাকে ও আছে; এই আধুনিক কবিতায় বাঙ্গলার জাত মারা গিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিতায় এমন করিয়া আমাদের জাত হারাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। আর একটা কথা, রামপ্রসাদের ঐ গানে শুধু বাৎসল্য-রস নহে, মধুর রসের ভিতর, যুগল সম্বন্ধের ভিতর বাৎসল্য কেমন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ফুটিয়াছে, তাহা একটু মনকে ঠিক রাখিয়া দেখিলে বুঝিবার অসুবিধা হইবেও না। দেশভেদে মানুষের যেমন চেহারাব পার্থক্য আছে, বিশিষ্ট জাতি আছে, তেমনি কবিতারও জাতি আছে।

ইহা ত গেল বাঙ্গলার খাঁটী কবি রামপ্রসাদ; ইহাকে অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ ফেলিবেন না; কিন্তু বাঙ্গলার কবি-চিন্তামণি চণ্ডিদাসের যশোদার বাৎসল্য সম্বন্ধে একটি গান আছে। সেটি এই :—

"তুমি মোর প্রাণ-পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা॥
মরু যেন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হ'তে বাপু ধেনু গোঠ মাঠ
না পাঠাব বন দিয়ে॥
কি বলিব নন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভূজঙ্গ রহে।
জানি বা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥

চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায়॥"

ইহাও সেই ঘোরো বাৎসল্য-রস, তাহা ঠিক, কিন্তু এ ছাড়িয়া যে কখন বাৎসল্য হয় না, তাহাও ঠিক।

"আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥"

মাতৃ-হৃদয়ের ভিতরের যে কথা, তাহা কি ব্যক্ত হয় নাই? খাঁটী বাঙ্গলা ভাষায় ছেলের "ভাল মন্দ কিছু হওয়া" মা ছেলের সম্পর্কে সে কি প্রাণের অন্তরতম রসের কথা ফুটিয়া উঠে; তাহা যে মাকে জানে, সেই সে বুঝে। যে জানে না, তাহার বুঝিবার উপায় মার আশীর্ব্বাদ। আধুনিক কবিতায় যে ছত্র দুইটিতে—

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে!"

আর চণ্ডিদাসের--

"আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।"

এই দুই শ্লোকের সঙ্গে যে ভাবের মিলন আছে, তাহাতে কি প্রমাণ হয় না, বৈষ্ণবের বাৎসল্য সজীব—সত্যি নাড়ী-কাটার ব্যথার সাড়া? ইহাতে মাতার যৌবন-স্মৃতি সুরভি মার মনের মধ্যেই আছে, ছেলেকে সে কথা জানাইবার অবসর হয় নাই। সন্তানকে পাইয়া মার মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া মাতৃত্বের সার্থকতা হইয়াছে, মা দার্শনিকতা করিয়া কবির মুখে তাহার জন্মকথা কহিবার অবসর পান নাই।

চণ্ডিদাসের যশোদা ও রামপ্রসাদের গিরিরাণী এই দুই চরিত-চিত্রের যে রঙ তাহা খাঁটী বাঙ্গালী মায়ের রঙে অঙ্কিত। মায়ের মুখের অঙ্কন, তাঁহার মুখের কথা কটি শুনিলেই তাহা যেন কেমন আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করে, মায়ের মতই মনে হয়। 'কোথা হইতে?' বা 'কোথায়?' এ সব প্রশ্ন তাহার

মধ্যে পরিস্ফুট ব্যঞ্জনা না থাকিতে পারে। এখানে ভবিষ্যৎ ও অতীত বর্ত্তমানের মাতৃত্বেই পূর্ণতমরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাতেই ডুবিয়া গেছে। এখানে জীবন মাতৃত্বে ও বাৎসল্যের মধুর রস-মুহূর্ত্তে কেন্দ্রগত স্থির ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল। এই প্রেমের চেয়ে সুন্দর কি আছে, এই মাতৃত্বের মত পূর্ণতা আর কি আছে? 'কোথা হইতে' ও 'কোথায়' ছেলের মুখের রূপ দেখিয়া মায়ের মনে ঠিক ঐ ভাবের রস ফুটে, এমন ত কখন মনে হয় না।

তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয় ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালী-কীর্ত্তন, শিবসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রাম দুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গলার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্য হইতে আরবী ফারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গলার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম-সমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য, এ কথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুকনা মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের তান্ত্রিক সাধনাঙ্গের ধারাও তখন কিছু বিশুদ্ধ ছিল না, অথচ রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি,—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এমন কি, এই দুই সাধন-পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাত তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবদেবী—চরিত্রের দুর্গতিই রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হয়,—যেমন আধুনিক কালের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, রামমোহনের দ্বারা সে নষ্ট-ধর্ম্ম ও লুপ্ত দেবদেবী-চরিত্রের উদ্ধার সাধন বা সময়োপযোগী কোন সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই। যাহা রামমোহনের প্রায় শতাব্দী কাল পরে পূতপ্রবাহিনী গঙ্গার তীরে তীরে কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে তাহার আভাস, তাহার উন্মেষ, তাহার বিকাশ, তাহার প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের জীবনে সেই মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু রামমোহনে তাহা ছিল না,—হয় নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে ধর্ম্মকে জাতিকে সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাহার বুদ্ধির অসামান্য প্রতিভার ঘোরতর মল্ল যুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন একথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে আমি বাধ্য হইব যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুব হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না বাঙ্গলার ভাষাকে ইংবাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি, আমাদের দেশের সাধনাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজি সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।

রামমোহনের আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য, ধর্ম্ম ও গান রামপ্রসাদের সুরে—তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—রামপ্রসাদ যে সুর গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তাব উল্‌টা সুর ধবিলেন। রামমোহন গান করিলেন,—

"অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈবাগ্য অভ্যাস কব, সত্যেতে নির্ভব কব॥"

আর রামপ্রসাদের গানেব সুব এই একটি গানে বেশ বুঝা যাইবে।

"আব ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়-পদ সার কবেছি, ভবে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো না গো। ১
ধনলোভে মত্ত হোয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-রাহুগ্রস্ত হোয়ে, মনের কথা খুল্‌বো না গো॥ ২
মায়া-পাশে বদ্ধ হোয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥"

ইহার সঙ্গে চণ্ডিদাসের,—

"সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে কবে পীরিতি,
দুখ যায় তারি ঠাঁই।"

তুলনা কতক হইতে পারে, ভাবের ধারা দুই জনের একই পথে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।

রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলায় আর খাঁটী বাঙ্গালীর কবি জন্মে নাই। রামপ্রসাদ এই জগৎকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাণকে যেমন মাতৃরূপে, জননীর মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, নিজের প্রাণকে যেমন মাতৃত্বের রূপান্তরে লইয়া গিয়া, আপনি আত্মস্থ হইয়া তাহাতে নিজেকে ও নিজের প্রাণকে, বিশ্ব-মাতাকে এক করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়া! বাঙ্গলাদেশে, বাঙ্গলাভাষায় তাহার আগে বা পরে, অমন আগমনী কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। আজিও বাঙ্গলার পল্লী-গৃহে, সহরের কোলাহলের মাঝে শরতে মহামায়ার সে আগমনী, পরিপূর্ণ স্বরে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ গাইয়া বেড়াইতেছে।

রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের প্রেমের যে রূপান্তর হইয়াছিল, তাহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও জ্ঞান গোষ্পদের তুল্য। মানুষ যখন প্রেমের ভিতর দিয়া স্বাধীন হয়, মিলিত হয়, তখন সে নির্ব্বাণ-মুক্তি চায় না, সে তখন তাহার প্রিয়তমের সহিত প্রাণের লীলাভঙ্গে আনন্দরস ভোগ করে—কে তখন তোমার মায়াবাদের সূত্র প্রতিপাদ্যের ধার ধারে। তাই রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।"

ইহার সঙ্গে মহাপ্রভুর,—

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবদাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" মিলাইয়া একই সুরের, একই ভাবের, একই স্রোতের টানে চলিয়াছে—

বাঙ্গলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম-ভক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা, বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, সেই সকল প্রমাণ তুলিয়া দেখান বাহুল্য ভয়ে আমরা দেখাইলাম না। দু'একটা স্থান দেখাইলেই সুধীজন তাহা সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"* * * যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পানপূর্ব্বক আপন আপন ইষ্টদেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রায় নাপিতানীর বেশ ইষ্টদেবতার করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াই বুড়ী ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপহাস করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়?"

রামমোহন রায় আজ নাই। রামমোহনের তর্ক-বিচার-ক্ষমতার কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না ও আমরাও করি না। কিন্তু প্রাণের অনুভূতির কাছে এই তর্ক-বিচার ও শাস্ত্রমীমাংসা গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে মায়া নয়, আর ইষ্টদেবতা, ভগবান্ যে এই আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া লীলার মধ্যে আনন্দ-ঘন চিন্ময়-রস আস্বাদন করিতেছেন, শঙ্করশিষ্য রামমোহন তাহা বুঝেন নাই। শাস্ত্রদর্শী রামমোহন তখনও রামানুজ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহা হইলে তাঁহার এই মায়াবাদেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে বাঙ্গলার শিরোমণি; তাঁহার পাণ্ডিত্যও কম ছিল না, শাস্ত্র ঘাঁটিতে তিনিও বিশেষ মজবুত ছিলেন, সকলের অপেক্ষা বড় কথা, আসল কথা, খাঁটী কথা এই যে, এই সব শাস্ত্রের অনুশীলনের উপরে যে প্রেমের সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা রামমোহনের ছিল না। আর সেই কারণেই দেশকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

আশা করি, রামমোহনের এই বেদান্তী মায়াবাদী ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির প্রাসাদের সমস্ত খিলান আলোচনা করিয়া সুধীজন দেখিবেন। আরব, পারস্য ও তুরস্কের মুসলমানী, দাক্ষিণাত্যি সভ্যতা ও বেদান্ত-মিশ্রিত খিচুড়ীর উপর ফেরঙ্গ ভাষা ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী রামমোহনকে বুঝিলে দেশের অনেকটা মঙ্গল হইবে, এবং তবেই আমরা এই ফেরঙ্গযুগকে সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। কবির গাইয়াছেন,—

"বহুতক সাহস করো জিয় আপনা।
তেহি সহবাসে ভেট না সপনা॥"

জীবনে বহুতর সাহস কর, সেই প্রাণপতির সহবাসের খেলাই চলিতেছে। এ জীবন স্বপ্ন নয়,—সত্য। মায়া নহে, মিথ্যা নহে। অণু-পরমাণু হইতে বিরাট্ বিশ্ব সব সত্য, সবই তাঁর রূপ। ইহাই সত্য। এই সত্য হারাইয়াছি। মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, পুরুষত্ব হারাইয়া এই স্ত্রী-জন-সুলভ আধুনিক দুর্ব্বল প্রেমের সাহিত্যে মসগুল্ হইতেছি। আমাদের নিজেদের উপর, আমাদের নিজেদের জীবনের উপর সে বিশ্বাস, সে আত্মনির্ভর হারাইয়াছি। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঐ যে চাষা মাটীর সঙ্গে কেমন করিয়া প্রাণ দিয়া পরিচয় লাভ করিতেছে, তাহা বুঝিবার কোনও সাধনা নাই। দেখিতেছি ধানের ক্ষেতের দোলা, আর ঐ আকাশের মেঘের রঙ। কিন্তু তাহার জীবনের পৃষ্ঠা আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের,—এই খোস-পোষাকী কর্পূর-সাহিত্যের,—এই শূন্য বিশ্বের দিকে উবিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত যে, বিশ্ব-সাহিত্য—তাহার পৃষ্ঠে কিছু ফুটাইতে পারিয়াছ কি? তাহাদের প্রাণের ভাবাভাব, সুখ দুঃখ, তাহাদের যে বিচিত্র রূপের লীলা, তাহা কি কখন একদিনের, এক মুহূর্ত্তের অনুভূতিতে আনিতে পারিয়াছ? বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ত দূরের কথা—সে সাধনা, সে সাধনের পথে যাহারা যায় নাই, তাহারা তো তাহা কোন

রূপেই প্রাণের অনুভূতিতে আনিতে পারিবে না। যদি পারিতে, তাহা হইলে মা'র, এ সাহিত্য-মায়ের অঞ্চলে অমনি সোনা ফলাইতে পারিতে, তোমাদের মানব-জন্ম এমন পতিত জমির কাঁটা ও ঘাসে ভরিয়া যাইত না; আবাদ করিলে সোণা ফলিত। শুধু তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাঁশী বাজাইত না। তাহার প্রাণের রাগিণী তোমার বাঁশরীতে প্রাণময় সুরের রূপ ধরিয়া দেখা দিত। সুরের আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ ফাটাইয়া ফুকারিয়া উঠিত। নকল করিয়া এমন নাকাল হইতে হইত না। জীবন আপনি তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলনা চলে না। জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়; নবযৌবনের দলের লীলা নয়; ইহা বিলাতী Coquetry জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

বাঙ্গলার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। সে মুসলমানী ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার প্রাণের স্রোতকে অনাবিলভাবে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার দল, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গলার খাঁটী কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালাদের গানের যুগের কথা আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষভাগে ঈশ্বর গুপ্তের যে হাস্যরস, তাহার কথাও কহিব।

এই ফেরঙ্গ যুগের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের এক বিরোধ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে সে একবার করিয়া সচকিত হইয়া নিজের মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তোলে, মুসলমান যুগেও তাহাই করিয়াছিল, আজ ফেরঙ্গ যুগেও তাহাই করিতেছে। একদিকে মুসলমান-ফেরঙ্গ-ধারা আর অন্যদিকে বাঙ্গলার নিজের ধারা। কবে মাটী আবার সেই ধারার মূর্ত্ত পুরুষকে জনম দিবে, তাহারই আশায় বসিয়া আছি।

অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দেশবাসী অসহ্যরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তমসাচ্ছন্ন অবসাদ। একদিকে এই অরূপের বিশ্ব-মোহ, তাহার সে জ্ঞান নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই, অতীত নাই—সব গিয়াছে। সংসার জ্বালাময়! সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, কোথায় বাঙ্গলার আত্মা! জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল—আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব। আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব। গ্রহ-নক্ষত্রে জ্যোতিকের দূরাগত পদধ্বনি কাণে আসিতেছে, বাঙ্গলা এ মিথ্যা রূপক ত্যাগ করিবেই করিবে। হে বাঙ্গলার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখি দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ, ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য

সেকালের সব রাজাদের, সব বড় মানুষের এক এক জন ভাঁড় থাকিত। তাহার সংস্কৃত নাম বিদূষক। ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখা-পড়া শিখে নাই, সংস্কৃত পড়ে নাই, সংস্কৃত বলিতে পারে না। অথচ সহবৎ ভাল, আচার ব্যবহার ভাল, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, বসা-দাঁড়ান, সব ভদ্রলোকের মত; এমন কি, ব্রাহ্মণের মত। ক্ষুধাও ব্রাহ্মণের মত, আহারেও ব্রাহ্মণের মতই প্রবৃত্তি, কিন্তু লোক ভাল; স্নেহ আছে, দয়া আছে, মমতা আছে; নিজের কাজ ছাড়ে না, যা মনে করে, সেটা করিয়াই লয়। এমন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে থাকিত। দুঃখের সময় তাঁহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিত। যখন দেখিত নিতান্ত কাতর, তখন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইত, তাঁহার দুঃখ দূর করিতে সহায় হইত। আর পাকা দরবারী লোকের মত অবসর বুঝিয়া কথা কহিয়া আপনার কাজ লইতে পারিত। তবে কেহ বা খুব চালাক চট্‌পটে হইত, কেহ বা একটু বোকা বোকা হইত।

দুষ্মন্তের ভাঁড়টি একটু—শেষ ধরণের—একটু বোকা বোকা। মৃগয়ার সময়ে নিবিড় বনে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম দেখা। রাজা ত বনে বনে কেবল "ঐ হরিণ, ঐ শূয়োর, ঐ বাঘ" করিয়া জানোয়ারের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ান, আর দুপুর বেলা, পোড়া মাংস,—শিক-কাবাব খান—সোঁতার জল খান, সে জলে পাতা পচিয়া তিত হইয়া গিয়াছে। আর বিদূষক বেচারাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটী করিতে হয়, হাত পায় ব্যথা হয়। আর এ রকম খাওয়া তার সহিবে কেন? রাত্রে ঘুম হয় না, রাত্রি থাকিতেই শিকারীরা মহা কোলাহল করিয়া বন ঘিরিতে যায়। বিদূষকের মনে মনে একটু গোদের উপর বিষফোড়া; ধিক্কার হইয়াছে,—এ ভাঁড়গিরি ভাল লাগিতেছে না। তাহার উপর আবার বনে একটা মেয়ে দেখে রাজার মন তাহারই উপর পড়িয়াছে, তিনি বাড়ী যাইবার নামও করেন না। বিদূষক মনে মনে স্থির করিল, আজ আর কিছুতেই শিকারে যাইবে না।. পারে ত কাহাকেও যাইতে দিবে না। সকালে উঠে রাজা আসিতেছেন দেখিয়া যেন হাত পা নাড়িতে পারিবে না, এইরূপ ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা আসিলে বলিল, আজ আমি তোমায় মুখেমুখেই "জীব সহস্র" বলি; হাত তোলার আমার ক্ষমতা নাই। সোজা কথা বলিলে ত' ভাঁড়ামী হয় না। রাজা গাএর ব্যথা কি সে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, নিজেই চোখে

কাটি দিয়া চোখে জল পড়ে কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ। রাজা বলিলেন, "বুঝিলাম না।" "আচ্ছা বেত-গাছ যে কুঁজা হইয়া পড়িয়া থাকে, সে কি নিজের সাধে করে? না, নদীর বেগে করে?" "নদীর বেগেই করে।" "তা হ'লে আমার হাত পা, আপনার জন্যেই ব্যথা হইয়াছে। আপনি রাজার কাজ সব ত্যাগ করে ত' শিকারী হইয়াছেন, কিন্তু আমাব যে দেহেব গাঁটগুলা কাঁড়া হ'য়ে যাচ্ছে, দেহ অবশ হয়েছে, আমায় অন্ততঃ এক দিনের জন্য ছুটী দিন।" রাজাও ভাবিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি আমারও মৃগয়ায় বড় ঝোঁক নাই, এও এই রকম বলিতেছে, কি করি। রাজাকে ভাবিতে দেখিয়া বিদূষক বলিল, "তোমার মনে কি হইতেছে, জানি না, আমার যেন অরণ্যে রোদন হইল।" রাজা বলিলেন, "না না, আমি কি, সুহৃদের কথা লঙ্ঘন করিতে পারি।" বিদূষক ভারি খুসী হইয়া "চিরজীবী হও" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন, "একটু থাক, আমি একটা সামান্য কাজে তোমার সাহায্য চাই।" পেটুক বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিল, "কি মোয়া খাওয়ার সাহায্য করিতে হইবে, তা হ'লে ঠিক লোক পাকড়াইয়াছ।" রাজা "বল্‌ছি" বলেই সেনাপতিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি আসিয়াই রাজার মন যোগাইবার জন্য মৃগয়ার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বন ঘেরা হইয়াছে, আপনি আর বসিয়া আছেন কেন?" রাজা বলিলেন, "মাধব্য মৃগয়ায় আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।" বিদূষকেরও যে দশা, সেনাপতিরও সেই দশা; তিনি বিদূষককে বলিলেন, "ভাই, খুব শক্ত হয়ে থাক, আমি রাজার মন জোগাই।" রাজাকে বলিলেন, "ওটা মূর্খ, ওর কথা কি শুনিতে আছে। মৃগয়ায় কত লাভ, শরীর ভাল হয়, জানোয়ার চেনা যায়, লোকে চটপটে হয়, এত আমোদ কি আর কিছুতে আছে?" বিদূষক বলিল, "রাজা ত কতকটা পথে এসেছেন। তুমি যাও, বনে বনে ঘুরে ঘুরে ভালুকের মুখে পড় আর সে তোমার নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে যাক্।" যা হোক, রাজা মৃগয়া বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন; বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন সৈনিকেরা তপোবনে অত্যাচার না করে।" বিদূষক বলিলেন, "কেমন, বড় যে উৎসাহ দিতে এসেছিলে।" সেনাপতি চলিয়া গেলেন। রাজা দরোয়ানকেও বিদায় করিয়া দিলেন।

মাধব্য বলিল, "একেবারে মাছিটি পর্য্যন্ত যে তাড়াইলেন। এখন এস, এই গাছ-তলায় বসা যাক, লতায় লতায় এর তলায় বেশ ছায়া হইয়াছে।" বসিলে পর, রাজা বলিলেন, "দেখিবার যে জিনিস, তাহা দেখিলে না, তোমার চক্ষু সার্থক হ'ল না।" মাধব্য বলিল, "কেন, আপনিই ত সম্মুখে আছেন।" বিদূষক বেশ বুঝিয়াছিল, রাজা সেই মেয়েটার কথাই পাড়িবেন, তাই যাতে সেটা না পাড়িতে পারেন, সেই জন্য রাজার চেহারার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ, সে ঠিক জানিত—সে বেশ জানিত যে,

নিজের চেহারার প্রশংসা করিলে খুসী হয় না, এমন লোক অতি কম। সে মনে করিয়াছিল, সেই কুৎসিত জামাইটার মত রাজাও হয় ত বলিয়া বসিবেন, "তেমু কত দিন ত্যাল মাখিনে।" কিন্তু বিদূষকের কোন চালাকী খাটিল না। রাজা শকুন্তলার কথাই পাড়িলেন। সে ভাবিল, কিছুতেই সে কথাটা পাড়ার সুযোগ দিবে না, বলিল, "ছি! সে যে তপস্বীর মেয়ে, তার কথা কি তোমায় ভাবিতে আছে?" রাজা বলিলেন, "না হে, সে তপস্বীর মেয়ে নয়, সে অপ্সরার মেয়ে। আকন্দ গাছে যেমন নবমল্লিকার ফুল পড়ে, তেমনি সে তপস্বীদের হাতে পড়িয়াছে।" বিদূষক তবুও আপনার গোঁ ছাড়ে না। বলিল, "খেজুর খেয়ে গলা কিটাইলে যেমন লোকে তেঁতুল চায়, আপনার হয়েছে তেমনি। এত রাণী থাকিতে আপনি চান কি না, একটা বুনো মেয়ে।" রাজা বলিলেন, "না হে, তুমি তাকে দেখ নাই, তাই এ কথা বলিতেছ।"

বিদূষক বলিল, "হবে, আপনার যখন পছন্দ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে রূপসী, এমন কি, রূপসীদেরও সেরা। তা হ'লে এখন শীঘ্র তাহার পরিত্রাণ কর। নহিলে কোন্ দিন তেলচক্‌চকে একটা নেড়া মাথার হাতে পড়িয়া যাইবে। আপনার উপর তার নজর কেমন?" রাজা বলিলেন, "আমি তাহার দিকে চাহিলে, সে চোখ ফিরাইয়া লইত; হাসিত, কিন্তু সে আমার কথায় নয়। তার মনের কথা লুকায়ও নাই, প্রকাশও করে নাই।" বিদূষক বলিল, "দেখবামাত্রেই কি তোমার কোলে ঝাঁপ পড়িবে না কি?" রাজা বলিলেন, "আসিবার সময় পায়ে কুশ ফুটিয়াছে বলিয়া সে ফিরিয়া আমায় দেখিতে লাগিল। বাকলখানা লাগে নাই, তবু যেন ডাল থেকে ছাড়াইতেছে—ভাল করিয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিল।" বিদূষক বলিল, "তবে আর কি? এখন পথ-খরচের জোগাড় কর। তপোবন যে তোমার শ্বশুরবাড়ী হইল দেখিতেছি।"

"কোন কোন ঋষি আমায় চিনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কি করিয়া দিনকতক এখানে থাকি, বল দেখি?"

"তার আর ভাবনা কি? বলুন, আমায় তোমাদের উড়ি ধানের ভাগ দাও।" বিদূষক এইবার বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিল। রাজা তাহাকে যেন তিরস্কার করিয়াই বলিলেন, "না হে না, তাঁরা যে আমাদের তপস্যার ভাগ দেন, সেটা যে হীরা-জহরতের চেয়েও দামী জিনিস।" বিদূষকও চুপ, রাজাও চুপ। রাজা নাকি ভারি ভাগ্যবান্, তাই ঠিক এই সময়েই দুই জন ঋষিবালক আসিয়া বলিয়া গেল যে, "ঋষিরা যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন আর রাক্ষসেরা আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়ে আবার কণ্বমুনি বাড়ী নাই। তাই আপনি যদি কেবল সারথির সহিত কয়েক রাত্রি এখানে বাস করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

বাঃ, রাজার কি অদৃষ্ট! তিনি কিছু দিন তপোবনে থাকিতে চান, আর ঋষিরা তাঁহাকে কয়েক রাত্রি থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আরও বলিলেন, কণ্বমুণি বাড়ী নাই এবং দুচার দিন আসিবেনও না। কারণ, তাঁহার শীঘ্র আসার সম্ভাবনা থাকিলে, রাজার দরকার না হইলেও হইতে পারিত। বিদূষক এমন ঠাট্টার সুযোগ ছাড়িতে পারিল না, সে আড়ালে বলিল, "এ যে 'অনুকূল গল-হস্ত'; আমরা বাঙ্গালায় বলিতাম, 'বাঃ, এ যে মেঘ না চাহিতে জল'; এই যে মেঘ না চাহিতে জল আসিল, এটা কি, আপনি আপনি হইল। কোন কোন সামাজিক বলিবেন, এটাও মেনকার খেলা।

রাজা ঋষিবালকেরা চলিয়া গেলেই হুকুম দিলেন, "রথ আন, তাতে যেন তীর ও ধনুক থাকে।" ঋষি বালকেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শকুন্তলাকে দেখিবার ইচ্ছা আছে?" বিদূষক বলিল, "খুব ছিল, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনিয়া একতিলও নাই।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমার কাছে থাকিবে?" "তাহা হইলেই আমার রক্ষা হইল।" বিদূষকের কথাটা ঠাট্টা কি না বুঝা গেল না। কিন্তু কবি কৌশলে বিদূষককে শকুন্তলা দেখিতে দিলেন না।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আবাব এক "অনুকূল গলহস্ত।" রাণীরা খবর পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাবা ব্রত কবিয়াছিলেন, উপবাস করিয়াছিলেন, চারিদিনের দিন তাঁহাদের পারণা। তাঁহাদের অনুরোধ, রাজা তাঁহাদের পারণার দিন কাছে থাকেন। রাজা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ঋষিদের আজ্ঞা এক দিকে, মায়েদের আজ্ঞা আর দিকে, তবে আমার ত যাওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে যজ্ঞের বিঘ্ন হইতে পারে। তা মাধব্য, তোমায় ত তাঁহারা ছেলে বলিয়াই মনে করেন। পারণার দিন তুমি তাঁহাদের কাছে থাক।" উত্তম আহারের গন্ধ পাইয়া বিদূষক নাচিয়া উঠিল, বলিল, "আমি রাজার ছোট ভাইএর মত, কুমার বাহাদুরের মত যাইতে চাই। আমি এখন যুবরাজ।" রাজা বলিলেন, "তা ত ঠিক, সব লোকজন তোমারই সঙ্গে যাউক।" মাধব্য বলিলেন, "আমি রাক্ষসের ভয়ে পলাইতেছি মনে করিও না।"

রাজা মনে করিলেন, এ বামুনটা 'ত' বড় পেট-প্রাতলা। যদি শকুন্তলার কথাটা বাড়ীতে ব'লে দেয়। মিছা একটা অনর্থ হইবে। বলিলেন, "দেখ ভাই! তপস্বীদের যজ্ঞের জন্যেই আমি রহিলাম। তুমি যেন তপস্বিকন্যার কথাটা সত্য বলিয়া মনে করিও না। ওটা আমি তোমায় পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম।" বিদূষকও তাই বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। ভবিষ্যতে রাজার ভুলিয়া যাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। মাধব্য শকুন্তলাকে দেখিল না; দেখিলে সে ভুলিতে পারিত না।

এক দিন না এক দিন মনে করাইয়া দিত। রাজাকে ভুলিতে দিত না। তাহার উপর রাজা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, ঋষি-কন্যার কথা সবটাই মিথ্যা। কেবল ঠাট্টা করিয়া আমোদ করিবার জন্য বলিয়াছি মাত্র। বিদূষকও সে কথাটা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, তাহার আহারের ভারি সুযোগ উপস্থিত। অন্য কোন কথায় তাহার মন দিবার সময় নাই। রাজা বলিলেন, আর সে বুঝিয়া গেল।

যে দিন কণ্বাশ্রম হইতে ঋষিরা আসিবেন, সে দিনও কবি কেমন কৌশল করিয়া বিদূষককে রাজার কাছ হইতে সরাইয়া দিলেন। রাজা ও বিদূষক দুজনে একটি গান শুনিতে পাইলেন; একজন গানে বলিতেছে—"ভোমর হে, তুমি নূতন মধুর লোভে আমের মুকুলে একটি চুমা দিয়া যেমন পদ্মের কাছে গিয়াছ, অমনি মুকুলের সব কথা ভুলিয়া গেলে!"

রাজা বলিলেন, "মাধব্য, বুঝিয়াছ কি বলিতেছে? আমি হংসপদিকার মহলে এক দিন মাত্র গিয়াছিলাম, তার পর বসুমতীর মহলেই থাকি। তাই সে আমায় বেশ দুকথা শুনাইয়া দিল। যাও ভাই, তাহাকে গিয়া বল, তাহার তিরস্কারটা আমায় বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে।"

"যাই বটে, কিন্তু অপ্সরা ধরিলে যেমন তপস্বীদের মোক্ষ আর হয় না; তেমনি হংসপদী একজনের হাত দিয়া আমার টিকীটী ধরাইয়া আর একজনকে দিয়া আমায় যখন উত্তম-মধ্যম দিবে তখন আমার আর কিছুতেই মোক্ষ হইবে না।" রাজা বলিলেন, "তুমি নাগর সাজিয়া যাও।"

সেকালে নাগর বলিয়া এক দল লোক ছিল। নাগরদের পৈতৃক সম্পত্তি থাকিত। তাহাদিগকে রোজগার করিয়া খাইতে হইত না। তাহারা ভাল লেখাপড়া শিখিত। বিশেষ কাব্য, অলঙ্কার, চৌষট্টি কলা, কামশাস্ত্রে প্রবীণ ছিল। তাহারা নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের মজলিস জমাইয়া দিত। কে ভাল নাচওয়ালী, কে কেমন গান করিতে পারে, কোন্ কুশীলবের দল কোথায় বায়না করিলে ভাল হয়; কোন্ নাচওয়ালী কোন মজলিসের উপযুক্ত; এ সব ঠিক করার ভার তাহারই উপর থাকিত। রাজা বিদূষককে বলিয়াছিলেন, তুমি একজন নাগরিক হইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা কর গিয়া। আমি যে তাহার তিরস্কারটা বুঝিয়াছি, সেটাও হংসপদিকাকে জানাইয়া দিও। ইহার ভিতরও কালিদাসের একটু কৌশল আছে। বিদূষক যদি রাজার দূত হইয়া যায়, তবে তাহাকে দূতগিরি করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আর যদি সে উদাসীন নাগরিক হইয়া রাণী সাহেব কেমন গান শিখিতেছ বলিয়া যায়, তাহা হইলে রাণীর কাছে বেশী আদরও পাইবে। আর তাহাকে অনেকক্ষণ

সেখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। শকুন্তলা রাজসভায় যতক্ষণ থাকিবেন, সে ততক্ষণ হংসপদিকার মহলেই কাটাইয়া দিবে।

আঙটী পাওয়ার পর রাজা ও বিদূষক দুজনে বাগানে গেলেন, সেখান হ'তে মাধবীলতার কুঞ্জে গেলেন। রাজার মন বড় খারাপ, তাই এবার বসন্তকালে উৎসবটাই মাটী। বাগানে আসিয়াই রাজা বলিলেন, "আহা, আমার প্রিয়া তখন আমায় মনে করাইয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করিলেন, তখন আমার মনটা ঘুমাইয়াই রহিল, এখন যে জাগিল, সে কেবল পস্তাইবার জন্য।" তখন বিদূষক আর এক দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, "এই রে, আবার শকুন্তলা-ব্যাধি উপস্থিত হইল, কেমন করিয়া ইহার চিকিৎসা হইবে জানি না।" রাজা একে একে কঞ্চুকী, প্রতিহারী সকলকেই সরাইয়া দিলেন। বিদূষক বলিলেন, "আপনি ত মাছিটি পর্য্যন্ত সরাইলেন। এখন আসুন, এই প্রমোদবনে বেড়ান যাউক, এ জায়গাটি বেশ—না ঠাণ্ডা না গরম।" রাজা বলিলেন, "বিপদের পরই বিপদ আসে। দেখ, শকুন্তলার কথাও আমার মনে পড়িল, আর মদনও ধনুতে আমের বউল চড়াইয়া বাণ মারিতে আরম্ভ করিল।" বিদূষক বলিল, "আমি এই বাঁকা লাঠীতে কন্দর্পের বাণ নাশ করি" বলিয়া আমের বউল ভাঙ্গিতে গেল। রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের তেজটা খুব দেখাইলে। এখন থাম।" তাহার পর বলিলেন, "কোথায় বসিয়া বল দেখি চোখটা জুড়াই; লতাগুলা দেখিতে প্রিয়ার মত। চল, লতা দেখি গে।" বিদূষক বলিল, "আপনি ত এই চতুরিকাকে বলিলেন যে, আমরা মাধবীলতার কুঞ্জে গিয়া বসি, সেইখানেই আমি শকুন্তলার যে ছবিখানি আঁকিয়াছি, সেইখানি লইয়া আইস। তবে চলুন সেইখানেই যাই।" সেখানে যাইবার সময় বিদূষক কুঞ্জের শোভা বর্ণন করিয়া রাজার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃথা। রাজা বলিলেন, "শকুন্তলাকে আমি যখন তাড়াইয়া দিই, তখন ত তুমি কাছে ছিলে না। কিন্তু পূর্ব্বেও ত কখন তুমি আমার কাছে তাঁহার নামও কর নাই, তুমিও কি আমার মত সব ভুলিয়া গিয়াছিলে?" সে বলিল, "না, ভুলিব কেন? কিন্তু তুমি ত অনেক কথা তার সম্বন্ধে বলিয়া শেষে বলিলে, এ সকল পরিহাসের কথা, যথার্থ বলিয়া যেন মনে করিও না। আমার বুদ্ধিটা বোকার মত কি না, তাই আমি তোমার কথাই ঠিক বলিয়া মনে করিয়া লইলাম। অথবা কি জান সবই ভবিতব্যতা! এই সময়ে শকুন্তলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাজার মোহ হইবার উপক্রম হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, আমায় রক্ষা কর!" বিদূষক বলিল, "এ কি হইল, এ রকমটা ত আপনার সাজে না। ভাল, লোক কি শোকের বশ হয়? পাহাড় কি কখন ঝড়ে নড়ে?" একবার বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাঁকে কে লইয়া গেল?" রাজা বলিলেন, "তিনি পতিব্রতা, তাঁহার অঙ্গ কি কেহ

স্পর্শ করিতে পারে? মেনকা তাঁর মা, সেই সম্পর্কে কোন অপ্সরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে।" বিদূষক বলিলেন, "তা যদি হয়, তোমার সঙ্গে তাঁর অবশ্যই মিলন হইবে। কেন না, মা কি আর কখন মেয়ের কষ্ট দেখিতে পারে? মেনকা অবশ্যই তাঁহাকে তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন।" রাজা বলিলেন, "সে যে স্বপ্ন, সে যে মায়া, একবার গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবে না।" বিদূষক বলিলেন "না, না—এই দেখুন না—এই আঙটীটার ব্যাপারই দেখুন না। ইহা হইতেই মনে হয়, কোন অদ্ভুত উপায়ে আশ্চর্য্যরূপে আবার মিলন হইবে।" আবার খানিক কাঁদাকাটির পর মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামের মোহর তাঁহাকে দিয়াছিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "আমি নগরে ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবে আবার খবর পাঠাইবেন?' আমি আমার হাতের আঙটীটি তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবার সময় বলিলাম, এই মোহরে যে কট অক্ষর আছে, একটি একটি করিয়া এক এক দিন গণিবে, যে দিন শেষ হইবে, সেই দিন আমার লোক আসিয়া তোমায় আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে।" "আচ্ছা, মাছের পেটে আসিল কিরূপে?" "শচীতীর্থে স্নান করার সময় হাত থেকে পড়িয়া গিয়াছিল। এ আঙটী সে হাত ছাড়িল কেন? ইহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিই।" বিদূষক মনে মনে বলিল, "এ তো পাগলামীর পথে উঠিল; আমার কিন্তু ক্ষুধায় প্রাণ যায়।" চতুরিকা শকুন্তলার ছবি আনিলে বিদূষক ছবিখানির খুব বাহবা দিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, "এ তিনটির মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলা?" তাহার পর বলিল, "ঐ যে আমগাছের তলায় একটু ক্লান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, উনিই তো শকুন্তলা।" রাজা তুলি ও রঙ চাহিলে বিদূষক জিজ্ঞাসা করিল, "উহার উপর আবার কি লিখিবে?" মনে মনে বলিল, "বোধ হয়, গোটাকত লম্বা লম্বা দাড়ীওয়ালা তপস্বী লিখিবে।" সে রাজাকে বলিল, "মুখটি ঢাকিয়া শকুন্তলা কেন চকিতভাবে রহিয়াছে?" তাহার পর প্রকাশ্যে বলিল, "এই যে একটা ভোমরা মধু-চোর ইহার সুন্দর মুখের দিকে তাড়া করিয়া আসিতেছে।" রাজা বলিলেন, "ওকে বারণ কর।" "তুমিই রাজা, দুষ্টের দমন তোমারই কাজ, তুমিই কর।" আবার বলিল, "এ বড় বাঁকা জাতি, বারণ করিলেও শুনে না" রাজা বলিলেন, "বটে, কথা শুনে না। আচ্ছা, শোন ভ্রমর, তুমি যদি পাকা তেলাকুঁচার মত উঁহার ঠোঁট দুটি ছোঁও, তোমায় আমি পদ্মফুলের পেটের ভিতর কয়েদ করিব।" "ও! কি ভীষণ শাস্তি, এতে আর ভয় পাবে না।" মনে মনে বলিল, "এটা ত পাগলই হইয়াছে, আমিও যে সেই সঙ্গে তাই হইতে চলিলাম।" আবার বলিল, "মহারাজ করেন কি? এটা যে ছবি।" বলিবামাত্র রাজার ভুর ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি

এতক্ষণে শকুন্তলাই দেখিতেছিলেন, সেই ভাবেই কথা কহিতেছিলেন। এখন ছবি শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাণী বসুমতী আসিতেছেন শুনিয়া রাজা ছবিখানি বিদূষকের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানি রক্ষা কর।" বিদূষক মনে মনে বলিল, "ছবি রক্ষা ত নয়, তোমাকেই রক্ষা করিতে হইবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাণীর হাত থেকে তোমার উদ্ধার হলে আমায় ডাকিও। আমি মেঘচ্ছন্দ নামক বাড়ীতে রহিলাম।"

খানিকক্ষণ পরে রাজা যখন সদাগরের জাহাজ ডুবি হইয়া মবাব কথায় বড়ই কাতর, হঠাৎ "মেঘচ্ছন্দ" হইতে "ওরে মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া বিদূষক চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা বুঝিলেন, বুঝি কোন অসুর বিদূষককে ধরিয়া লইয়া যাই-তেছে। তিনি তাড়াতাড়ি ধনুক ও বাণ লইয়া সেখানে গেলেন। গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিদূষক কাতর স্বরে বলিল, "আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি, তুমি আমায় দেখিতে পাইতেছ না। আমায় কে একটা আক ভাঙ্গার মত তিন টুকরা করিয়া ফেলিতেছে। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, তেম্‌নি আমায় ধরেছে। আমার আর রক্ষা নাই।" রাজা বলিলেন, "বটে, তুমি মানুষের চোখের অগোচর থাকিতে পার বলিয়া তোমার বড় জাঁক হইয়াছে; আমার বাণ এমন নয়, তোমায় মারিবে, ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবে। এই আমি বাণ ছুড়িলাম।" বলিবামাত্র একটি দিব্যপুরুষ রাজার সম্মুখে উপস্থিত, সঙ্গে বিদূষক কাঁপিতেছে। রাজা বলিলেন, "কে ও মাতলি, দেবরাজের কুশল ত?" বিদূষক বলিল, "বাঃ! আমায় যে প্রাণবধ করিতে উদ্যত, তুমি তাহাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতেছ!" রাজা শিষ্টা-চারের পর মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদূষকের উপর আপনি এ ব্যবহার করিলেন কেন?" মাতলি বলিলেন, "আমি দেখিলাম, কোনও কারণে আপনি বড় কাতর, তাই আপনাকে একটু রাগাইবার জন্য, একটু উত্তেজিত করিবার জন্য—এ কাজটা করিয়াছি। আমি জানি, কাঠ নাড়িয়া দিলে তবে আগুন জ্বলে, লেজে পা পড়িলে তবে সাপ ফোঁস করে। একটা হ্যাঙ্গামা না পড়িলে মানুষের রোখ হয় না।" রাজা বলিলেন, "মাধব্য, তুমি অমাত্য পিশুনকে বল, তুমি আপনার বুদ্ধিবলে কিছু দিন রাজ্য চালাও, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত রহিলাম।" বিদূষক চলিয়া গেল।

মাধব্য রাজার যথার্থ হিত চায়। বাড়াবাড়ি দেখিলে সে তাহাকে বেশ এক হাত লয়। শকুন্তলার ব্যাপারে রাজা যখনই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, সে তাহাকে তখনি ঠাট্টা করিয়াছে, কিন্তু যখন জানিতে পারে, রাজা যথার্থই কাতর, তখন সে তাঁহার দুঃখে দুঃখী হয় এবং তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। তপোবনে

রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "শকুন্তলার কথাটা সবই মিথ্যা, পরিহাস মাত্র।" সে সরল ভাবে তাহাই বুঝিয়াছিল, তাই সে কথা সে কখন আর রাজার কাছে পাড়ে নাই। সে জন্য সে দুঃখিত, "বুদ্ধিব ঢেঁকী বলিয়া" আপনার নিন্দাও করিয়াছিল। সে এক এক করিয়া সব কথা শুনিয়া লইল। শকুন্তলা কে? কে তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেল? কেন তাকে আঙটী দেওয়া হইয়াছিল? কেমন করিয়া সে আঙটী মাছের পেটে গেল? ছবি আসিলে সে ছবির যে দোষগুণ বলিল, আর কি লিখিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। কিন্তু বুদ্ধির দোষে ছবি লইয়া রাজা যখন তন্ময়, সেই সময় বলিয়া ফেলিল, "কর কি? এ যে ছবি।" রাজার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি অধীর হইলেন, এমন সময়ে রাণী বসুমতীর খবর আসিল। সেই ছবি রাখিবার ছলে কবি মাধব্যকে সরাইয়া দিলেন। সে রাজার চমক ভাঙ্গিয়া দিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল, এ তাড়ানটা যেন তাহারই শাস্তি। উহার উপর মাতলির যে অত্যাচার, সেও যেন সেই শাস্তিরই শেষ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

রস-বাহিনী

[অনুবাদ]

নব বলে গুরু- গিরির চরণ লঙ্ঘিয়া
ধরম করম সরমের সেতু ভঙ্গিয়া
প্রেমে উনমতি পতি-তরু পথি বর্জ্জিয়া
উদ্দেশে তব ধাইল দুকূল মর্দ্দিয়া
রাধিকা রস-রঙ্গিনী ;—
না ধরি বক্ষে কৃষ্ণ সাগর !
কেন তুলি ছল- বচন-লহর
বিমুখিলে বৃক-নন্দিনী ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

কমলের দুঃখ

(সুধীর—কমল)

ভায়া,

তুমি এসেছিলে, তা আমি খবর পেয়েছি। আমার ওপর দিয়ে একটা ঢেউ চ'লে গেছে—আমি তায় ভেসে গেছি—ভাসাই যখন জগতের গতি—তখন আর খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? নদীস্রোতে একটা ঝরা পাতার মত ভেসেছি ত—ভেসেই যাই। তুমিও ভাস্‌ছ ভাস। সুখ, দুঃখ, আশা, সাধ সবই ত ঐ গণ্ডীর মধ্যে; তবে ভেসে যাও, কে কূলের ঠিকানা করতে চায়? কূল কোথায় যে, কিনারায় যাবে? কোথা থেকে? কোথায়? এর উত্তর দিতে পার—পারবে না, মিছে কেন বকে মরি। যতক্ষণ আছি, ভেসে যাই—কিছু না কিছু না,—ঢাল, ঢাল, পানপাত্র পূর্ণ কর—আঙুরের বুকের রক্তে—প্রাণ যতক্ষণ আছে—ততক্ষণ তাজা কর—যে দিন ফুরুবে, সে দিন ফুরুবে—ভাব্‌বার নেই। এই দেখ, এই শোন, সুরা কি বলছে। ঐ শোন, বুলবুল কি বলছে। শুধু সুর, শুধু গান, শুধু সে সুরা—সুরা। আমি ভেসেছি—আমি যাকে গণ্ডী দিয়ে মনে করেছিলাম আমি, সে ভেসে গেল, ব'লে গেল ভাস, জানিয়ে গেল না; শুধু ভেসে গেল, কোথায়, তা জানা গেল কি?—না, শুধু ভেসে গেল, আমি ত ভেসে গেছি, আর আমার খোঁজ কেন? সুরা! সুরা! ঢাল ঢাল, পানপাত্র পূর্ণ কর, যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ তাজা ক'রে রাখ। সবই স্বপন, যদি এত বড় সত্যিই যখন স্বপ্ন, তখন দেখি—স্বপন ভাল ক'রেই দেখি। ফুল ফুট্‌ছে, হাজার ফুল ঝর্‌ছে, তায় আমার কি! আমার গন্ধ হলেই হ'ল। ওই শোন বুলবুল কি বলছে, ফুলের দিনে ফুল ফোটে, আবার ঝরে—ফুট্‌লেই ঝরে। আমি যেমন গানে মজেছি, অমনি ভেসে যা—যা যা ভেসে যা। তর্ তর্ তর্ তর্—ছল্ ছল্—কলল্—কল নদী চলেছে; আমিও ভেসেছি, আমায় আর পাবে কোথা—আমায় খুঁজ না, আমি ভেসে গেছি—গেছি নয় যাচ্ছি—কোথায়? শুধু কোথায়—কোথায়? জানি কি, জানি না—তাও বোঝবার নেই—ভেসেছি।

ওই ত অন্ধকারের উপর অন্ধকার জমাচ্ছে, ভাস্‌তে ভাস্‌তে আস্‌ছে, ভাস্‌তে ভাস্‌তে যাচ্ছে—একা ভাস্‌ছে—স্রোতের মাঝে আমি যেমন ঝরা পাতা, এ ধরাও তাই। ঢাল ঢাল, পূর্ণ কর, ঢাল, আঙুরের রসে ভোর হয়ে থাক। ডাক্তারেরা কি জানে, তারাও ত ভাসছে; যে ভাস্‌ছে, সে আবার আটকাবে কি, কিছু না—না—কিছু না; পূর্ণ কর পানপাত্র, ওই দেখ, কত শাদা কথা বল্‌ছে, মজগুল হয়ে থাক—যাক্,

দুনিয়াও ভাসছে, তুমিও ভাসছ। কে চায় জ্ঞান—সেত ওই অন্ধকারে বাজের আগুন—মিথ্যা ভ্রম, এই ত। যে ভ্রমণ করে, তারই ভ্রম হয়—ফেলে দাও সব, শুধু ভেসে যাও, হোক্ আঁধার, আঁধারে কি ভয়, নদী ত চলেছে, ধাক্কা লাগ্‌লেই কথা, যেই তটের বুকে আঘাত, অমনি ভাষা ফোটে এই ত ; গতিরোধ হয় না। চলেছে ; ও ভাষাও মিথ্যে—মিথ্যেত মিথ্যে—আমার কি, সুরা ! সুরা ! মজগুল হয়ে আছি—বাঃ, বাঃ ! আছি কি নেই, নেই কি আছি, কে জানে, ভেসেছি, ভেসেই যাই। দেখ, কষ্টিপাথরে ঘষে দেখে, সোণা খাঁটী কি খাদ। এ জগতের—এ জগৎ খাঁটী কি খাদ, তার কষ্টিপাথর কি জান—ওইটে ; যে আসে আর যায়, জানিয়ে যায় না,—ওই মৃত্যু ! পাথরের মত, প্রকাণ্ড কাল কষ্টিপাথরের মত—জগৎটাকে ক'সে দেখা গেল ; সব খাদ অথচ দিব্যি সোনার হার ক'রে গলায় পরে হাসি ! এই ত, ও জ্ঞান চাই নি, যাক্ চুলোয় যাক্, ঢাল ঢাল সুরা ! সুরা ! মজ্‌গুল হয়ে থাক। মজ্‌গুল হয়ে থাক, এ স্বপ্ন ভাঙবে ভাঙুক, ফোটা ফুল ঝরে যাবে যাক্, ঝরল ঝরল ; ফুটে ছিল, ঝরে গেল, আমার কি,—আমার সুরা, আমার সুরা আছে, ঢাল ঢাল, পূর্ণ কর পানপাত্র। ভেসেছি ত ভেসেই যাই—যাই ! ওঃ বিস্মৃতি ! বিস্মৃতি ! কত দিনে ফেলে দেব এ কালের কাহিনী ! গঙ্গায় ঢল নেবেছে, কূল ভেঙেছে, আমি ভেসেছি—ভেসেই যাই !

(ইন্দু—কমল)

সুচরিতেষু,—

তোমার চিঠি পড়েছি ভাই ! তবে এ আমি কেমন ক'রে ফেলে দেব বল, আমার অনেক সাধনার ফুল অকালে না ফুটেই ঝ'রে গেল। যে মুকুলের মাঝে ইচ্ছা তার ফলের আশাখানি পোষণ ক'রে রাখে, সে না ফুট্‌তেই, ফলে পরিণত না হতেই নির্ম্মম কাল তাকে ছিঁড়ে নিলে তরুর কি লাগে না,—পাকা ফল গাছ থেকে আপনি পড়ে যায়, ফোটা ফুল আপনি ঝ'রে যায়—তাতে তরুর লাগে না। তাতে সে বোঝে, ফুলের ও ফলের সার্থকতা হয়েছে—কেউ জগতে সুবাস সুগন্ধে ভ'রে দিলে কেউ জগতে মিষ্ট স্বাদে ভরে জগজ্জনকে তৃপ্ত করলে ; তাদের সার্থকতা হ'ল। এর ত তা নয়। নির্ম্মম কাল শুধু আমার মা হওয়ায় হিংসা ক'রে নিয়ে গেল, কি করব হাত নেই, তা জানি, তবু কাঁদি, না কেঁদে যে থাকৃতে পারি না ভাই ! ফলের আশা কুঁড়িতেই শুকিয়ে গেল, মা হওয়ার সঙ্গে সংসারের সাধ সব ম'রে গেল। কি করব, ভগবান্ দিয়েছিলেন, তিনি নিয়ে নিলেন। সামান্য মেয়েমানুষ, কিসের কার্য্য-কারণ হাঁতড়ে মর্‌বো, ও বুঝে কাযই বা কি ? সবাই এক জায়গাই যাব, এই ভরসা—হবে ! কবে হবে ভাই, তাই ভাবি।

দেখ শূন্যকে আশ্রয় ক'রে কেউ থাকৃতে পারে না, হারা রতনের জন্যে মন কেবলই

যতন করে, না ক'রে, তার উপায় নেই। খালি হাতে কেউ থাকতে পারে না। খালি মনে কেউ থাকতে পারে না।

কা'ল একটি নতুন মুখ আমাদের বাড়ী এয়েছে, মুখখানি দেখেই আমার তাকে বুকের ভেতর ক'রে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছে, ঠিক আমার সেই ছোট বোনটির মত। তেমনি চোখ, তেমনি নাক, তেমনি ঠোঁট, তেমনি সব—তবে এ তার চেয়ে আরো একটু ফর্সা, তুমি হয় ত বুঝতে পাচ্ছ না যে কে; কিন্তু তুমি একে খুব জানো, তোমার আশ্রয়ের জন্যেই সে এসেছে। আমি কিন্তু ঠাকুরঝির কাছে একে রাখতে দেব না—এ আমার ছোট বোন, আমি একে আমার বোনের মতই রাখ্‌ব, তোমাদের আমি দেব না। আমার কাছে যখন আগে এসেছে, তখন কেন আমি তোমাদের দেব?

কা'ল বিকালে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখি ওই মেয়েটা একটা সাঁওতালের মত চেহারা বেশ জোয়ান লোকের সঙ্গে, আমাদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। এক পা ধূলো—এ দিকে আমি তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় ফিরে দেখি, সেই মেয়েটা এসে তোমার নাম ক'রে দরোয়ানের কাছে কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কে গা তুমি?'

'এখানে কি কমলনাথ বাবু থাকেন?' বল্‌তে যেন একটু থতমত খেলে।

'না, এখানে ত থাকেন না—এ তাঁর বোনের বাড়ী।'

'থাকেন না' বলেই মেয়েটি কেঁদে ফেল্‌লে, যেন মহা ভাবনা ও নিরাশার মাঝে সে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বল্লাম, 'তা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? এ তাঁর বোনের বাড়ী—আমি তাঁর দিদি হই; এস, এস, তুমি ঘরে এস।'

সঙ্গে যে সেই কালপানা লোকটা এসেছিল, সে বল্লে, 'এ পাগ্‌লী, হামি তবে চলি যায়, ও বাবুকো ত ঠিকানা মিলা, আব্‌ হাম ঘর চলে'—আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, 'হাম্‌রা পাহাড়ী আছি মা—এর বাপটা মরিয়ে গেছে, ওকে দেখে, এমন কেউ আছে না, হামাদের সাথে তো ও থাকে কেম্‌নে, তাই বাবুর কাছে আস্‌লো। হামি সাথে সাথে বরাবর আস্‌ছি। এ সব সহর্‌কা লোক বড় কেমন আছে, সব ভাল না, তব্‌ বাবু বড় আচ্ছা আদ্‌মী। আচ্ছা হামি যায় পাগ্‌লী।' যাবার সময় একবার ছলছল-চোখে সেই প্রকাণ্ড কাল পাহাড়ের মত পাথর-কাটা গড়নের মূর্ত্তি চোখের জল ফেলে চলে গেল। এখন বোধ হয়, বুঝ্‌তে পার্‌ছ এ কে—আহা, এর বাপকে সাপে কামড়েছে, তাতেই তার মৃত্যু হয়। সেদিন তার বাপ তাদের ক্ষেতের বাঁধ ভেঙে গিছল বলে লোকজন নিয়ে সেই বাঁধতে যায়, সন্ধ্যার আগে ফেরবার সময় পথে সাপে কামড়ায়, ওই পাহাড়ীরা কোলে করে নিয়ে আসে; এনে অনেক রকম চেষ্টা করে কিছুতেই কিছু হয় না। তখন ওই যে সঙ্গে করে

রাখতে এসেছিল, সে বলে যে, ওখানে মুখ দিয়ে বিষ চুষে বার করে দেব, তা ও মেয়েটা কিছুতেই রাজী হয় না; সে ওই পাহাড়ীকে সে করতে দেয় না, আর জাত-ভাইয়েরাও বলে, না। তবুও পাহাড়ী ওর নাম কি কান্নু না কি—সেই সাপের কামড়ের জায়গায় মুখ দিয়ে সেই বিষ বার করতে যায়,কার কথা শোনে না। তারপর পাহাড়ীটা খানিক পরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মেয়েটার বাপও একটু যেন চাঙ্গা হয়। হলে হবে কি, তখন বিষ মাথায় উঠেছে—বাপ বাঁচলো না। পাহাড়ী কান্নু তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়েছিল—তার পর ওরা পাহাড়ী, ওরা—অনেক ওষুধ পত্র জানে, কোন রকমে বেঁচে যায়। জবা তাই বলছিল, 'যে ওই পাহাড়ীরা আমাকে এত ভালবাসত যে, তারা আমার কান্না মোছাবার জন্যে—সাপের মুখে যেতে ভয় পেত না। তবু আমিত ওদের কাছে থাকতে পারি নি—আর বাবা মরে যাবার পর সবাই আমায় পাগ্‌লী ব'লে উড়িয়ে দিলে, খুব কাঁদলুম। পুরুতরা আমাকে শ্রাদ্ধ করাতে চায় না। ওই পাহাড়ী কান্নু কোথা থেকে বামুন নিয়ে এল, আমি ত ও সব জানি না—কি সব করলে। তার পর ভাবলুম, কোথা যাই, এখানে একলা থাকব কি ক'রে—তাতে এই সব গোঁড়েরা সব দিবারাত আমার কাছে রামায়ণ গান শোনবার জন্যে আসে, আমি এখানে কি ক'রে থাকব? কমলবাবুর এ বাড়ী থেকে একখানা চিঠিতে ঠিকানা পেয়ে ভাবলাম, এইখানে আসি, তিনি কি আমায় ফেলে দেবেন? আমার যে আর কেউ নেই। ব'লে মেয়েটা কেঁদে আকুল, আমি তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে আমার কাছে রেখেছি। আহা! মাতৃহারা-পিতৃহারা সবাই আমরা এক জায়গায়, তাই বুঝি হয়। আহা, থাক্ আমার কাছে থাক্, সে কাল থেকেই আমায় দিদি দিদি করছে। আমি কিন্তু তোমাকে একে নিয়ে যেতে দেব না। তার এই সব শুনে খুব কষ্ট হ'ল, আমিও শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলুম। জবা কান্না দেখে বললে, দিদি, তুমি কাঁদছ কেন? আমার কান্না দেখলে ওই পাহাড়ী কান্নু কেঁদে ফেলতো। তাই আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এলুম, আমি আর কাঁদব না, কাঁদলে সবাই কাঁদে। না, আমি আর কাঁদব না। আহা, দিদি! ও আমায় এত ভালবাসে যে, আমি যে দিন ওকে বল্লুম, 'কান্নু, আমি কলকাতায় বাবুর কাছে গিয়ে থাকব', ও খানিকক্ষণ আকাশ পানে চেয়ে—চুপ ক'রে মাটীর দিকে নীচে তাকিয়ে রইল—কি ভাবলে ওই জানে। আমি বললুম, 'কান্নু, আমি কাল যাব, তুই আমায় দিয়ে আসবি। কান্নু বল্লে 'হামি! আচ্ছা কবে যাবি?'—আমি বল্লাম 'কাল'। শুনে, আহা বেচারা যেন কি হ'য়ে গেল, অনেকক্ষণ আমাদের সেই তুলসীতলায় ব'সে রইল, তারপর বল্লে, 'আচ্ছা—চল, যাবে হামি—।' তার পর ওর কাছে চাবি দিলাম, ও আমাকে সঙ্গে ক'রে কত ক'রে তবে এইখানে নিয়ে এল। পথে লোকে আমাদের মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। আমি ভাবলাম, আমরা গরিব, তাই

এরা বুঝি হাস্‌ছে। দুঃখীকে কেউ দেখ্‌তে পারে না দিদি! তবে কমল বাবু ত অমন নয়।'

কমল! এত সরল, এমন সোন্দর, একদিনেই যেন কত সে আপনার—আহা—আমার এমনি দুঃখ হচ্ছে। কোথা থেকে যে কি মানুষের হয়! আমি তা ভাবৃতেই পারি নি। হাতে কাজ ছিল না, মনে হয়েছিল, সব কাজই ভগবান্ ফুরিয়ে দিয়েছে—একটা কাজ পেলুম। দিন কাটাবার একটা উপায় হ'ল। কত কেঁদে আর দিন গুণে ফুরব বল। তাই বুঝি বিধি একে মিলিয়ে দিলে। তার পর আবার বল্‌লে—'দেখ দিদি, বাগানটা ছেড়ে আস্‌তে বড় মায়া হচ্ছিল, ওই সব ফুলগাছগুলো, সেই মাধবী লতার গাছ—সেই বড় বড় গাছের ডালগুলো—ওই সে ঘাসের ফুলগুলো—তারা যেন আমায় বারণ কর্‌ছিল—তাদের ছেড়ে আস্‌তে। নদীর জলের ধারে সেই বটতলায় যেখানে ওই বটগাছের শেকড় মোটা মোটা ঝুরিগুলোর ওপর নদীর জল উছলে উছলে পড়ে, সেই গাছে ছুটো চকাচকী আছে, তারা আমায় কত বারণ কর্‌ছিল—সন্ধ্যের সময় যখন স্যিয়্যি নদীর জলে লাল থালার মত সেই দূরে পাহাড়ের পেছনে চ'লে যাচ্ছিল, সে যেন বল্‌লে, যাস্‌নি জবা যাস্‌নি! আমি তবু থাক্‌তে পারলুম না, কেমন যেন বুকের ভেতর ক'রে উঠ্‌ল। বাবা মরে যাবার পর আর আমি তুলসীতলায় আলো দিতে যেতে পারি নি। তা আমি তোমার কাছে থাক্‌ব দিদি!' যেন আমি কত দিনের জানাশোনা, সত্যিই যেন এ আমার বোন্। আবার মনে হয়, এ পাগল নয় ত এ সব কি কথা!

তুমি এখনি আবার বেড়াতে যাবে কেন? অমরের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয়, তবে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি কি একবার আস্‌বে না, একবার এস। আর সংসারে সবই বদল হয়ে যাচ্ছে, সবারই ভার আবার হয় ত তোমারই ওপর পড়্‌বে। যেমন এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছ, তেমনি সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে। দেখো!

উনি যেন কি রকম হয়ে গেছেন। বাইরে বাইরে থাকেন, দেখা হ'লে উন্মনা হয়ে আকাশ পানে তাকান, আবার তখনি চ'লে যান; আফিস আদালত বন্ধ করেছেন, বল্লাম, উত্তর দিলেন, 'হুঁ—বিশেষ দরকার ত নেই।' রোজই বাগানে চলে যান, কোন দিন ফেরেন, কোন দিন ফেরেন না। সে দিন অনেক রাত্রে ফির্‌লেন—জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। কি ভেবে অনেকক্ষণ পরে বল্লেন, 'এমনি—গান-বাজনা হচ্ছিল।' ক'দিন থেকে আসেন নি। মনটা সে জন্যে ভাল নেই। কোথাও বাইরে বেড়াতে গেলে হয় না? তুমি যদি যাও আমার ভরসা হয়, তা হলে ওঁকে নিয়ে যাই। ভাই! আমার কপাল ভেঙ্গেছে, আবার কি কর্‌তে কি হবে। প্রাণে যেন সদাই নূতন বিপদের

ভয় হচ্ছে। কে জানে, তাঁর মনে কি আছে। কখন আমার ভাবনা ছিল না। আজ সব দিয়ে ভাবনাই আমার বড় হয়েছে। এক দিন মনে করতুম সার্থক আমার জীবন, আজ মনে হচ্ছে, সকলের চেয়ে আমার জীবনই ব্যর্থ। এক দিন মনে করতুম, আমি সবার চেয়ে সুখী, আজ মনে করছি, আমি সবার চেয়ে দুঃখী; আমার মত হতভাগিনী আর কে? তুমি মার পেটের ভাই না হয়েও—ভাইয়ের মত ভাই। তাই তোমার কাছে দুটো কথা খুলে বলতে পারি। মনের এ খেলা কত রকমেই হয়। তাই ভাবনা হয়, তাই ভাবছি—আবার উনি কেন এমন হ'য়ে বেড়াচ্ছেন—বুঝতে পাচ্ছিনি কি যে হবে। তুমি কি একবার খোঁজ নিতে পারবে? আর ত কার সাহস হবে না—আর কারও কথাও ত তিনি কাণে দেবেন না। যে মানুষ!

তুমি সে দিন যে এসেছিলে কখন তা আমি জানতেও পারি নি। ভিতরে আস নি কেন? না, কেন আসবে! না—না, ঠিক কাজ করেছ, তবে আমার সঙ্গে দেখা করতে কি দোষ হয়েছিল। না, ভালই করেছ, তুমি বুদ্ধিমান্ তোমায় বলবার কি আছে? তিনি ত কি অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছেন, তা বুঝতে পারছি নি, একবার খবর নিয়ো। আব কাকেই বা বলব? আশীর্ব্বাদ করি, কিন্তু কি ব'লে যে আর আশীর্ব্বাদ করব, তা বুঝতে পারি না। তবু বলি, চিরজীবী হও ভাই!

তোমার—ইন্দু দিদি

(মায়া—কমল)

হে প্রাণাধিক প্রাণেশ,

জীবনের এ পরিবর্ত্তন কত রকমে কত দিক্ হ'তে আর আমায় অনুভব করাবে নাথ! হে ঈপ্সিত! তোমাকে পাবার জন্যে আমার এ ধ্যান, তোমার ওই মধুর অরূপ রূপকে সম্ভোগ করবার জন্যে আমার এ চিরতরে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি, তুমি বিনা আর কেউ নির্ব্বাণ করতে পারে? যতক্ষণ তুমি আছ ততক্ষণ আমি আছি। জীবনের দীপ যে দিন নিভে যাবে, এখান থেকে সেখানে গিয়ে কোথায় কোন দূরে—আবার যে দিন দীপ জ্বেলে ব'সে থাকব, সেখানেও কি তোমায় পাব না? কেন পাব না—আমি যে তোমায় চাই। আমি যে তোমায় ভালবাসি। আমি তোমায় পাবই। দীপ জ্বেলে বসে আছি, কবে আসবে নাথ!

দুঃখের জীবন দুঃখ দিয়েই ঘোরাল হয়ে ওঠে। চঞ্চল আলোকে যেমন আঁধার গাঢ় হয়ে আসে, দুঃখের জীবনে ক্ষণিক সুখের তপ্ত উচ্ছ্বাস জীবনের আঁধার ছায়ায় আরো ছায়া ঢেলে দেয়। হায়, মিহিরকে বুকে করে জীবনে যেন এক স্বপ্নের মত জাগরণ আসছিল। নিষ্ঠুর! তাও আমার বুক থেকে কেড়ে নিল। ভুল করেছিলাম, তাই শোধ নিচ্ছ। এত ভালবাসা সমস্ত সেই রক্তময় চোখের জলে ধুয়ে ফেলেছ বন্ধু—

শুধু রেখেছ বজ্রের নিশ্বাস। আমি নারী দুর্ব্বলা—হে সুন্দর! আমায় এত শাস্তি কেন? এক ফোঁটা,—বেশী চাই নে এক ফোঁটা—এ শুষ্ক তৃষিত কণ্ঠে এক ফোঁটা বারি দান কর। সাহারার মরুভূমিতে পড়ে প্রাণ কণ্ঠাগত বঁধু, পিপাসা মিটাও, একটু মধু ছিটাও!

বহুদিন অদর্শনের আঁধারের পর তোমায় যখন দেখ্‌লাম; দেখলাম রুদ্রমূর্ত্তি—কোল থেকে জীবনের জীবন, প্রাণের রতন—জগৎভোলানমুখ ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলে। হায়! এত ভালবাসার এই কি পরিণাম—এই শাস্তি, কিন্তু অপরাধ? শুকনো ফুল এখনও আমার কাছে—তাই আমার জীবন। যে টাট্‌কা ফুলের মালা গলায় ফাঁসির মত লেগেছিল, সে ফাঁস ত আমি খুলে ফেলেছি। অজ্ঞানে না জেনে—ভুলে অর্দ্ধ জাগরণের অবস্থায় যদি ভুল ক'রে থাকি, তার কি ক্ষমা নেই নাথ—তার কি বিচার নেই? কত শাস্তি দেবে বল। আমি ত তোমারই, তুমি যদি রাখ বাঁচ্‌ব, মার—মর্‌ব। এই ত আমার কাহিনী—এই ত আমার ছুটো কথা, যত কথার মধ্যে—তুমি। এমনটা যে কেন হ'ল, তারই খেই খুঁজে মরি। পাই না, আঁধারে কেঁদেই দিন যায়।

যে দিন প্রথম ও রূপ দেখেছিলাম, সে দিন মনে হয়েছিল, কি মধুর জগৎ। সেই দিন যেন নূতন জীবন। কিন্তু কে জান্‌ত যে, রূপের এত জ্বালা! সে জ্বলুনি থামে না—দহনে নিবৃত্তি নেই, তবু রূপ চাই। হে রূপ, তুমি ধরা দিয়ে কেন লুকালে—কেন আলো দেখিয়ে ফিরে অন্ধকার আন্‌লে—কেন মত্ততায় মত্ত করে অদৃশ্য হ'লে। আশা বাড়িয়ে নিরাশ কর্‌লে বল, এ জীবন নিয়ে কতকাল আর চেয়ে চেয়ে থাক্‌ব। শুধু চেয়ে থাকাই সার। তারা যেমন তারার পানে চেয়ে থাকে।

তোমার সেই জবা,—তোমারই জবা কেমন সুন্দর গায়, এমন মিষ্টি গান আর একজনের শুনেছিলুম। সে কে, তা নিশ্চয়ই তুমি জান। কে একে এ সব গান শেখালে। এমন সুন্দর মালা গাঁথে, দে'খে মানুষের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু—বল বল, ব'লে দাও—আমার প্রাণ তাকে দে'খে অবধি এমন শিউরে উঠে কেন? বড় ভাল লাগে, আমাদের যেন কিসে ভুলিয়ে রেখেছে। তবু, গলায় গলায়, হাতে হাতে ধ'রে বেড়াই। তার মাঝে কেন, এ কিসের ছায়া পড়ে? গান শুনি, হঠাৎ চোখ জলে ভ'রে আসে—জবা অবাক্ হয়ে মুখের পানে তাকায়, বলে, 'কেন গান শুনে তোমরা কেঁদে ফেল, আমি আর গাইব-টাইব না বাপু হ্যাঁ—কেবলই তোমাদের কান্না। সোন্দরে বুঝি কাঁদে? তুমি ত সোন্দর, তুমি কেন কাঁদ্‌বে?' তার কথার ভাব পাইনে—বুঝ্‌তে পারি না—কি এ।

সুখ-দুঃখ অনেক দেখলাম, দুঃখ সুখের কথা অনেক শুন্‌লাম, কিন্তু আমার মত দুঃখী কে আছে কমল! এ দুঃখের মাঝে জবা কেন এল। আমার—আমার,

আবার যে প্রাণে কি জেগে ওঠে নাথ! মনে যা ভাবি, তা মুখে ফুট্‌তে পারি নি। মনের এ কান্না ভাষায় বুঝি ফোটে না। শুধু জ্বালাই জ্বলে। হায়! নারীর মন—সে যে অতটুকুও সইতে পারে না। তবে যার দুঃখের সমুদ্র, তার আর দু একটা নদীর ধারে কি কর্‌বে—যেখানে মিশ্‌বে, সেইখানেই প্রথম কোলাহল, তার পর একই—সমুদ্রে সব মিশে এক। দুঃখে আর ডরাই নি নাথ, যদি তোমায় পাই—আঁধারে কে রাখে ভয়! সুখ-দুঃখ সবই এখন তুমি।

চিঠিতে জানাতে চাই পরের কথা, কিন্তু নিজের কথাই সব ভ'রে ওঠে। যতটা খালি থাকে, সবটাই নিজের নিশ্বাসে—আরশিতে মুখ দেখতে গিয়ে যদি নিশ্বাস পড়ে, আর মুখখানা দেখা যায় না—আমার চিঠিখানাও তেমনি নিশ্বাসে ভিজে উঠে—সব মুছে যায়। আরশিতে নিজের ছবি পড়লেই তখন যে আমার নিশ্বাস পড়ে, সে নিশ্বাসে সবই যে কেমন হয়ে যায়। একটী একটী ক'রে সুখের কুঁড়ি ফুটিয়ে তুল্‌ব মনে করেছিলাম, আজ দেখছি, একটী একটী ক'রে ঝ'রেই গেল—তারা ফুট্‌তে আর পেলে না। এত সব সাধ, অকালে হেলায় বুঝি ম'রে গেল। আর তারা আমার সুখের সখী হ'ল না।

আজ কয়দিন ধ'রে মন যেন কি হয়ে রয়েছে—দুর্দ্দাম তৃষার জ্বালা আমায় যেন আগুনের মত সংহার কর্‌তে চায়। এ কি আর মিট্‌বে না। আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল্‌তে হবে—বল, বাঁচ্‌ব কি মর্‌ব—একটা কথার উত্তর দাও। আর তোমায় সে—এর উত্তর পেলে আর তোমায় বল্‌ব না—শুধু বল, বাঁচ্‌ব কি মর্‌ব? জীবন ত তোমার হাতে অনেক দিন ফে'লে দিয়েছি। মৃত্যুও তোমার হাতে ফেলে দিলাম। বল, শুধু একবার তারই উত্তর দাও। হে জন্ম-মরণ-হরণকারী রূপ—আমায় সেই কথাটা ব'লে যাও—জীবনে আর তোমায় কোন কথা বল্‌ব না।

সকাল থেকে দেখতাম, গাছে মুকুল দুল্‌ছে, দুজনে সমুদ্রতীরে কত কথা কয়েছি—সে কথা ফুরুত না। যখন সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকারে ছেয়েছে, তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে ও সমুদ্রের হাওয়ায় হো হো হলহলা উঠেছে—তখন সেই মুকুল, ফুলের পাপড়ি খুলে নিজেকে যখন দুল্‌তে দুল্‌তে ফুটিয়ে তুলেছে, সন্ধ্যা-তারকার আলো তার মুখখানির উপর পড়েছে, তখনও কথা ফুরুত না। শেষ চুম্বনেও সে ফুরুত না—ফুলটা তাই দে'খে কত হাস্‌ত! আমরাও হাস্‌তাম, আবার চুমুতে এক হয়ে যেতাম—আর আজ একটা কথাও মেলে না। দেখি, ফুল ফুট্‌লে ঝরে, আমি যে কবে ফুট্‌লাম, আর কবে ঝরে গেলাম! ইতি

মায়া।

(মায়া—নগেন)

দেখ, ছোট ছেলে যেমন দিনে দিনে বড় হয়, তার প্রকৃতিকে জগতে জানায়, যেমন বিষাক্ত ফুল ফুট্‌লে ধীরে ধীরে তার বিষে সর্ব্বলতাকে জর্জ্জরিত কর্‌বার জন্যে

বিষ ছড়ায়, আজ তোমার মধ্যে যে সয়তান দিন দিন পুষ্ট হয়ে আস্‌ছিল সে তার পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়েছে। কি ভয় দেখাও পুরুষ! সংহারের? তুমি কি মনে কর, নারী বড় দুর্ব্বলা, তুমি মনে কর নারী ধূলার কীট, তাকে অবাধে পায়ে দ'লে চ'লে যেতে পার্‌বে? তুমি কি মনে করেছ এ জগতে তুলাদণ্ড নেই, যে তোমার ওই সংহারের ওজন কর্‌বে না?—কর্‌বে,—কর্‌বে,—কর্‌বে! তখন বুঝ্‌বে—সত্য আছে কি না। ধর্ম্ম আছে কি না। অপরাধ তোমার কি আমার। অপরাধ ক'রে থাকি, তার শাস্তি বহন কর্‌তেও প্রস্তুত থাক্‌ব। বলেছি ত সম্পর্ক নেই, তবু কেন এ আহ্বান?

আমি প্রলাপ সৃষ্টি করেছি, আর তুমি প্রলয় কর্‌বে, পার কর। কিন্তু জেন, যে গড়্‌তে পারে সেই ভাঙ্‌তে পারে। সৃষ্টি যদি আমি ক'রে থাকি, আমি যদি গ'ড়ে থাকি, আমিই ভাঙ্‌তে পারি—এ বিশ্বকে রেণু কর্‌বার শক্তি তোমার নেই। আমার সহ্যের সীমা আছে জেন। জেন নারী আরো ভীষণ, যাতে উপরে আগুন দেখা যায় না তার ভিতরেই বেশী আগুন থাকে। যেখানে সমস্ত নিঃশব্দ, সেইখানেই সকলের চেয়ে আলোড়ন। বৃথা—বৃথা—আমায় তোমার সংহার-ছবি দেখাচ্ছ, সে ভয়ে নারী কখন ভয় মানে না। উত্তর দিতে ইচ্ছা ছিল না—তবু দিলাম, তোমাকে বোঝাবার জন্যে। বোঝ!

'ম'

কমল—মায়া।

মায়া!

রুদ্রদণ্ড সহ্য কর্‌বার শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে এই চিঠি আমার পড়ো—আর তা যদি না পার, তবে না পড়ে গোড়ায় সাম্‌লে যেয়ো, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ো। আজ আমার ব্যবহার, এত দিনের ব্যবহার,—শাস্তি কি শাস্তির আশীর্ব্বাদ, তাই ভেবে দেখ। তুমি কি বুঝ্‌বে, এ অন্তরে কি বিশ্বদাহনকারী ব্যথা নিয়ে কাটিয়েছি। তুমি কি বুঝ্‌বে, এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মাঝে সমস্ত সুখ ত্যাগ কর্‌বার প্রাণ কত বিস্তৃত—উদার অনন্ত আকাশের মত—মেঘের রোল ও বজ্রের দাহন! অর্থ, যশ, মান, ভোগ কর্‌বার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পেয়ে যে সে সুখকে অবাধে হেলায় ফেলে দিয়ে স'রে রয়েছে—সে নিজে শাস্তি বহন কর্‌ছে, না শাস্তি দান কর্‌ছে? এই বোঝ। আজ তোমাকে কিছু বল্‌তে চাই। জানি না, এরপর আবার তোমায় বল্‌ব কি না। বহুদিন পূর্ব্বে তোমায় বলেছিলাম যে, বাতাসও তোমার কথা এখানে কানাকানি করে না। কেন তবে এ ঊর্ণনাভের মায়া-জাল রচনা কর্‌তে এত সাধ—এত আকাঙ্ক্ষা! তুমি চাও সুখ, তুমি চাও রূপ, তুমি চাও সম্ভোগ,—আমি চাই না রূপ, আমি চাই না সুখ, আমি চাই না সম্ভোগ। তুমি চাও সমস্ত সংসার হেজে

যাক্ পুড়ে যাক্, তোমার ওই প্রাণের সাধ, আকাজ্ঞা তৃপ্তি লাভ হোক্, আমি চাই—আমার এ সুখের—দেহের—মনের সুখের স্বাচ্ছন্দের বিসর্জ্জন দিলে সংসার যদি বজায় থাকে, সংসারে শান্তিলাভ হোক্। তোমায় আমায় মিল্‌তে পারে না—মিল্‌তে পার্‌বেও না। একই সূর্য্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে পৃথিবীর গতির একধারা, দক্ষিণায়ণে আর একধারা। তুমি তোমার সুখকে, সুধু আপনার উপভোগের মধ্যে গণ্ডী দিয়ে রেখেছ, যেখানে পথ পাচ্ছ সেইখানে আপনাকে নিয়ে গিয়ে সুখের আগ্রহ পূর্ণ কর্‌তে যাচ্ছ, আমি আমার সুখকে যেখানে পথ পাচ্ছি, সেইখান থেকে তাকে বা'র করে নিয়ে অন্তের জন্তে সে স্থান খালি ক'রে এগিয়ে দিচ্ছি। তবে কেন আর আমায় তোমার এ মায়া-ডোরের বাঁধন দিতে চাইছ বল?

তোমায় আমায় যখন প্রথম দেখা-শোনা—সে কথা আমি ভুলি নি। তুমি আমায় চাও, তা জানি, আমিও যে তোমায় চাই তাও তুমি জান। আমি ভুলি নি—কিন্তু সে এখন আলাদা জগতের কথা। তোমায় বল্‌তে নেই যে, আমি চাই। আমায়ও বল্‌তে নেই যে আমি চাই। যদি নিজের সুখ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে আমার তৃষ্ণা হ'ত, তা হ'লে তোমার বিয়ের দিন তার বদল কর্‌তে পারতাম কিন্তু তোমার পিতার ইচ্ছা তা ছিল না, আমার প্রাণের ভায়ের ইচ্ছা তোমায় লাভ করে, উভয়ের মনের আঘাতকে দেখে আমার সুখের ইচ্ছাকে আমি বলি দিয়েছি। যে দিন বুঝ্‌লাম,—ইন্দুদিদি, বৌদিদি, নগেনের সঙ্গে তোমার বিবাহের জন্য উৎসুক, আর তোমার, তা থেকে—তোমার দিক্ থেকে কোন প্রতিবাদ হয় নি—তখন আমি হাস্‌লাম, ভাবলাম—নারীর চঞ্চলমতি। চিলে যেমন তার খরনখে কপোতের হৃৎপিণ্ড ছেদন করে, তেমনি করে নিজে নিজের হৃদয়কে ছিন্ন ক'রে ফেল্‌লাম—সেই শুধু দু ফোঁটা জল পড়েছিল, সে শুধু, আমি মানুষ ব'লে। তার পর সমাজ আমার কাছে দেবতা, ভাই আমার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ, তাদের রক্ষা আমার ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বস্বত্যাগে সেই ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বার জন্ত আজিও প্রাণপণ যত্নবান্। বল্‌তে পার সকলের পানে তাকালে, কেবল তাকাও নি আমার দিকে। সেটা তোমার ভুল, যখন বুঝ্‌লাম, এদের মঙ্গলে তোমায় মঙ্গল; যখন বুঝ্‌লাম, নগেনের কল্যাণই তোমার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তখন তোমার দিকে পূর্ণমাত্রাই তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম, যে আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব—তাকে এ দারুণ অবস্থায় কেমন ক'রে সুখী করব। আজিও তুমি হৃদয়সর্ব্বস্ব আমার, কিন্তু সে সম্পর্ক হৃদয়ের, দেহের নয়। সে সম্পর্ক অনুভবের, ভোগের নয়; সে সম্পর্ক রূপ-সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি, সম্ভোগের জ্বালা নয়; সে সম্পর্ক বিশ্বের আত্মার, গণ্ডীর 'আমি'র নয়; সে সম্পর্ক নরনারীর নয়, সে সম্পর্ক প্রাণের 'তুমি, তুমি।'

অনেক দিন অনেক কথা মনে হয়েছে, তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি

এ কথা আর তোমায় বল্‌তে নেই। তুমি আর আমার সেই কমলালেবু-গাছের তলায় ফুটন্ত মায়া নও, সংসারে রঙ বদ্‌লে গেছে—এখন তোমায় ভালবাসি বল্‌তে নেই—শুধু তোমায় ভালবাসি বল্‌তে নেই, বল্‌লে—আবার বাজ পড়বে, সব জ্ব'লে যাবে। ভালবাসি বল্‌লে সব গাছের পাতা নিশ্বাসে শুখিয়ে যাবে, শ্মশান হয়ে যাবে। কাউকে এ কথা জগতে বলতে নেই—কেবল লুকিয়ে রাখতে হয়, বললেই সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে পুড়ে যায়। হাজার বাঁধনে মাটীর সঙ্গে আমি বাঁধা, এখন শুধু তোমায় ভালবাসি বল্‌লে হবে না। আমি গাছপালা, পাতা, ফুল, মানুষ, আকাশের সকলেরই ও সবাই আমায় ভালবাসে, আমি তাদের 'ভালবাসির'—তুমিও যেমন আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, জবাও তেমনি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, নগেনও তেমনি আমার প্রাণস্বরূপ, এই ফুলটাও তাই—কেননা, আমার হৃদয় আমার নয়—সে ওই মাটীর।

গভীর নিশীথে যখন মেঘ অন্ধকার ক'রে এসেছে, ঝিম্-ঝিম্ ক'রে ঝিল্লিকার কুহক-তানে, মন্ত্র যখন ঘুমের বুড়ি পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, ভেকের ডাকে আর মেঘের আলোতে যখন গাছের তলায় বেড়াতে বেড়াতে তোমার নাম ক'রে ডেকেছি, সমস্ত প্রকৃতি চম্‌কে উঠেছে, গাছগুলো নিশ্বাস ফেলেছে, বিদ্যুতের আলো যেমন গাছের একটি একটি পাতায় চম্‌কে উঠেছে, তখন তারা বলেছে, ও কথা বলতে নেই, একা ভালবাসি বল্‌তে নেই, আমরা কি তোমার পর, আমরা যে তোমায় ভালবাসি। ও গাছ বলেছে আমি যে তোমায় ছায়া দি, মেঘ বলেছে আমি যে জল দি, ঘুমের বুড়ি বলেছে, আমি যে তোমার ক্লান্তি দূর ক'রে নিদ্রা ঢেলে দি, যখন ঘুমাও, তখন তোমার শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দি, শুধু, শুধু তাকেই ভালবাস?'—আমি ত তোমার একলার নয় মায়া!

হে আমার প্রাণের অধিক প্রাণ, হে আমার নিভৃত হৃদয়ের শান্ত সুন্দর, হে আমার জগৎপ্রতিমার মাধুর্য্যে ভরা মানসী প্রতিমা, আমি শান্তি চাই! আমি বন্ধন চাই না, মুক্তি চাই! আমি গৃহকোণে আঁখির ভিতরে বিশ্ব দেখতে চাই না, বিশ্বের মধ্যে তোমার আঁখি দেখ্‌তে চাই। বিশ্বের মাঝে তোমায় ভালবাস্‌তে চাই! বিশ্ব থেকে ছিঁড়ে এনে চাই না। সমুদ্রে বারিবিন্দু উপভোগ করতে চাই, ও বিন্দুতে পিপাসা আমার মিটাতে চাই না, সুখ চাই না, সুখের সাগরে মিশ্‌তে চাই। মধু পান কর্‌তে চাই না, মধু হ'তে চাই। প্রেমিক হ'তে চাই না, প্রেম হ'তে চাই। সত্য উপলব্ধি কর্‌তে চাই না, সত্য হ'তে চাই! পূজো আর কর্‌তে চাই নে, পূজোর ফুল হ'তে চাই। ঘাসের ফুল থেকে আকাশের তারার সঙ্গে এক হয়ে থাকৃতেই চাই। আর সেব্য-সেবক হয়ে প্রতিমা আঁক্‌বার শক্তি চাই না।

আর দুটো কথা ব'লে শেষ কর্‌ব। বাঁচা ও মরা—জন্মমৃত্যুর দায়িত্ব যার যার নিজের, আমি তোমার জীবন অধিকার করি নি—মৃত্যুর কথা ত ছেড়েই দাও। যা তোমার

অধিকারে নেই, তা আবার অন্যে অধিকার করবে কি ক'রে? কেউ কাকেও অধিকার করতে পারে না। অধিকার নিজের উপর নিজেরই নয়—নেই। ও বিষয়ে উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই।

দেখ, কেউ কেউ সংসারে আসে, তাদের সুখ সয় না—দুঃখ সয়। একটুখানি সুখও তারা সইতে পারে না, আর দুঃখের বোঝা তার শিরে চাপিয়ে দাও—বহন করবে। যারা কেবলই সুখ চায়, তারা পায় না; যারা সুখ চায় না, তারাই সুখ পায়। তুমি যে সুখের জন্য ভগবান্ ত্যাগ করলে, যে সুখের জন্য অগ্নিসাক্ষী স্বামী ত্যাগ করলে, সে সুখ কতটুকু পেয়েছ, তার চেয়ে দুঃখ কতখানি বেশী। সংসারে যেমন আলো অন্ধকার, এ পিঠ আর ও পিঠ,—তেমনি সুখ আর দুঃখ দুই পাশাপাশি। যতই তুমি জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে—ততই সে তোমার উপর জোর ক'রে আসবে। তুমি সমস্ত জগতের মাঝে থেকে তোমার সুখকে আলাদা করে নিতে গিয়েছ, জগৎ দিয়েছে সেই সঙ্গে তার অনন্ত দুঃখের ভার। তার সুখ নিলে দুঃখ দেয়—তার দুঃখের ভার নিলে সুখ দেয়। এই রীতি—এই নিয়ম। বিচ্ছিন্ন করাই দুঃখ, বিচ্ছিন্ন করাই পাপ। এ পাপে মগ্ন আর হয়ো না।

যত দিন আমি এ ধরায় আছি, তত দিন আমি শুধু তোমার নয় জগতের। এ আমি একা কিছুই নয়। জগতের মধ্যে আছি, তাই আমি। যদি কখন মনের অবস্থা তোমার পরিবর্ত্তন হয়, যদি কখন বুঝতে না পার, অনুভব করতে পার, যে সংসার তোমা ছাড়া নয়—তবে যেন আমায় কোন বিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করতে সাহস ক'র না। আমি এ ধরায় কার উপর কোন অধিকার নিয়ে আসি নি—তবে আসি। ভগবান্ তোমায় শান্তি দিন। আমি অনন্তগতি।...ইতি

কমল।

কপটী

[অনুবাদ]

ওগো সুন্দর! ওগো মনোরম!
লুকায়ে রয়েছ মন্দিরে মম
ধরিয়া গোপন ফাঁসী;
পলাইতে চাই, পথ নাহি পাই,
সবলে চরণে টানিছ সদাই,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সারেঙী

(১)

অসময়ে জরা তাহার শুক্‌না হাতের পরশ আমার সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইতেছিল; কিন্তু লোকে তখনও আমায় সুন্দরী বলিত। আমিও আরশির ভিতর নিজের রূপ অহরহঃ দেখিতাম। হাঁ, সুন্দরী বৈ কি! দেখিতাম, কাল মেঘের মত আঁধার কেশজাল তেমনি ঘোর করিয়া আমার রূপকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া ছাইয়া আছে, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে যেন সমস্ত রস শুকাইয়া লইয়া, শুধু মাদকতার অগ্নি-রেখাটুকু ক্ষীণ জিহ্বার মত লক্‌লক্ করিতেছে, সে মেঘে বরিষার বর্ষণের কোন আভাস নাই। তবু রূপ নিভিবার পূর্ব্বে তৈলহীন দীপের মত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সুন্দরী ত বটেই। যদি সুন্দরীই না হইব, তবে এ রূপের কি এত দর হয়?

ছিল—সমস্তই ছিল। এই রূপ—এই ঐশ্বর্য্য—বিলাস-বাসনার লক্ষ বাহু-ফাঁস তখনও এই শ্লথচর্ম্ম শিথিল পেশীর বিজড়িত শিরার বাসনাসিক্ত প্রবাহের মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া ছিল। এত ভোগ করিয়া ও ত নিবৃত্তি হইতেছিল না। তাই এই রূপের বিপণিতে রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা সমস্তই বিক্রয় করিতে বসিয়াছিলাম। আমি ক্রেতা বুঝিয়া দর করিতাম। উচ্চমূল্যে—হাজার হাজার আস্‌রফির বিনিময়ে নিশায় নিশায় আত্মবিক্রয় করিতাম। সে বেচায়-কেনায় সুখ ছিল না। ছিল জ্বালা—কিন্তু তবু লালসার বহ্নি নিভিত না।

দিল্লীর বড় বড় ওমরাহ—বড় বড় রাজা মহারাজা—আমার দ্বারে দ্বারী। বোধ হয়, তাহারা আমার সুকোমল হস্ত হইতে এক পেয়ালা সিরাজীর পরিবর্ত্তে আপনার তৃষাতুর বক্ষের এক পেয়ালা উত্তপ্ত রক্ত মাপিয়া দিতে কোনই কুণ্ঠা তাহাদের ছিল না, দ্বিধাও করিত না। এমন কি, আমার বহ্নিজ্বালা-দীপ্ত বিলোল কটাক্ষের তীক্ষ্ণ সায়কে বিদ্ধ ও আত্মহারা হইয়া তাহাদের গৌরবান্বিত উষ্ণীষ আমার পদতলে লুটাইয়া দিতে পারিলে পরম কৃতকৃতার্থ মানিত।

কিন্তু এত করিয়াও আপনাকে ভুলিতে পারি নাই। বাসনার ভরপুর পরিবেশন করিতাম, বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিত না। প্রাণের ভিতর প্রত্যহই কি যেন কিসের অভাব গুমরিয়া মরিত। এত বিলাস-সম্ভোগের মধ্যেও যেন সময়ে সময়ে হৃদয়ের কোন অজানা তারের মধ্যে সহসা কে আসিয়া ঝনাৎ করিয়া তারের ভিতর হইতে একটা ঘা দিয়া ঝনন্ করিয়া আপনা আপনিই বাজিয়া উঠিত। সে ঝঙ্কার মর্ম্মের প্রত্যেক

রাগিণীর সহিত তীব্র মর্ম্মভেদী মূর্চ্ছনায় আলাপ করিতে করিতে আমাকে তন্দ্রাহত ও অবশ করিয়া ফেলিত! গৃহভিত্তি হইতে অন্তর, বাহির, আকাশ ও বাতাস হাহা করিয়া ফাটিয়া যাইত।.

(২)

আমার স্বামী মোগল রাজদরবারের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। পুরুষোচিত পৌরুষ ও রূপ এবং কণ্ঠভরা সুর ও মেঘগম্ভীর স্বর ছিল বলিয়া রাজ-দরবারে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এই রূপ এবং সুরই তাঁহার কাল হইয়াছিল! এই সুর আর রূপ উভয়ে মিলিয়া তাঁহার জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার এই অসামান্য রূপ ও সুরের প্রভাবে অনেকেই তাঁহাকে প্রাণমন পর্য্যন্ত সঁপিয়া দিতে পারিত, আবার কেহ বা নিতে পারিলেও ছাড়িত না! কিন্তু জানি না—কেন—হতভাগিনী আমি—তাঁহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারি নাই। আমি চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাঁহার সেই ভালবাসায় কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতাম না, তৃষা মিটিত না। সহস্রমুখী তৃষা অন্তরে অন্তরে লোলরসনা লক্‌লকি জ্বলিয়া মরিত। স্বামী অহর্নিশি আমার কর্ণে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় গ্রামে-গ্রামে সঙ্গীতের মদিরা ঢালিয়া দিতেন, আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রামে যে অভাব অহরহঃ জ্বলিয়া মরিত তাহার তৃষা মিটিত না, তাহাকে আরও ক্ষুরধার করিয়া তুলিত।

আমরা তখন আগ্রায় থাকিতাম। অদূরে সুনীল গগন-চুম্বী শুভ্র তাজমহলের উন্নতশীর্ষ মিনারগুলি আমাদের বাতায়নপথ দিয়া বেশ পরিষ্কাররূপে দেখা যাইত। বসন্তের শ্যাম সন্ধ্যালোকে চন্দ্রচ্ছায়া-উদ্ভাসিত যমুনার অশ্রান্ত উৎফুল্ল তরঙ্গগুলি যখন আবেগভরে নাচিয়া নাচিয়া নিদ্রিতা তাজ-বিবির পদতল ধৌত করিয়া দিত, আমি তখন ছাদের আলিসায় ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া স্বামীর নিকট সারঙ্গ শিক্ষা করিতাম। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই সঙ্গীত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বড়ই নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন। বহির্জ্জগতের কোলাহল তাঁহাকে বড় একটা উত্যক্ত করিতে পারিত না। অশ্রু-টলটল উদাস আঁখি দূর আকাশ ও জলরেখার পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেন, কখনও আমাকে কিছু বলিতেন না।

দিন গেল সহসা একদিন স্বামী বাড়ী ফিরিলেন না। রাত্রি গেল, প্রভাত হইল, ভাবনায় আকুল হইলাম। সখী গুলসানার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শুনা শুনিয়া আসিল, দিল্লীর তক্তের বিরুদ্ধে এক ভীষণ রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সরকার তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন! তাঁহার মত মানুষ যে কখনও কোন হীন ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ও জড়িত থাকিতে পারে, এ কথা আমার প্রথম একেবারেই বিশ্বাস হইল না।

রাজাজ্ঞায় স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। পিতা আমাকে লইয়া দিল্লী আসিলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজাদেশ প্রত্যাহৃত হইল না।

তার পর বৎসরেক কেহই স্বামীর কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন নাই। একবার লোকমুখে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বন্দী নন; পলাইয়াছেন, পারস্যের শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন; কিন্তু কিছু দিন পরে অকস্মাৎ খবর আসিল, জনরব মিথ্যা,—কাশ্মীরের রাজপথে তাঁহার বজ্রাহত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া পিতা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অনাহারে দুশ্চিন্তায়, অপমানে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনিও আমায় কাঁদাইয়া ফেলিয়া পলাইলেন

আমি তখন একা। আশ্রয়হীন, অর্থহীন, সহায়হীন। সব গেল—কেবল শুল যায় নাই। দিন যায়, মাথা রাখিবার আশ্রয়, আর পেটের ক্ষুধার খাদ্য—তাহাও রহিল না। তাহার উপর সরকারের তাড়না। শুল আশ্বাস দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতাম,—মনে করিলাম, সঙ্গীত অনুশীলন করিয়া নিজের দিন গুজরাণ করিব। কিন্তু পারিলাম না। লূতার ন্যায় আপনার লালায় জড়িত জালে আপনি জড়াইয়া মরিলাম! ভিতরের,—প্রাণের ভিতরের জ্বালাময়ী সঙ্গীতের সুর আমাকে বাহিরে টানিয়া আনিল!

(৩)

রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া সারেঙী গাইতেছিল—

"চল চল রে ভঁবরা কঁবল পাস।
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত বহ বার বার।
তন বন ফুল্যো ডার ডার॥"

শুভ্র জ্যোৎস্না। তাহার করুণ-সঙ্গীত দখিণা হাওয়ায় বাতায়নপথে আসিতেছিল। সে দিন বাদ্‌শাহের প্রধান অমাত্য আমার অতিথি। আমি কি তখন জানিতাম যে, তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় আমার স্বামী ষড়্‌যন্ত্র অপরাধে অপরাধী স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন—তিনিই আমার স্বামীকে সরাইয়া নিজে তাঁহারি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমি তাঁহারই মুখে সিরাজী তুলিয়া ধরিয়া দিলাম! প্রাণে কি যেন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ বোধ হইতেছিল! রমণীর সমস্ত কঠিনতম রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলা সে দিন উত্তমরূপেই আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। অজ্ঞাতে প্রাণের ভিতরে তীব্র জ্বালাময়ী সাপিনীর গরল ঢালিবার জন্য প্রাণ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে আমিও যেন তার বশীভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। অমাত্য আমায় জানিতেন কি না, আমি তাহা জানিতাম না। আমি দিল্লীতে ছদ্মনামেই পরিচিতা ছিলাম।

সারঙ্গী পুনরায় গাহিল—

"খোজ করত বহ বার বার
তনবন ফুল্যো ডার ডার"

অকস্মাৎ কেন যে আমার হস্তস্থিত পানপাত্র কাঁপিয়া উঠিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না! ডাকিলাম,—"গুল্! গুল্!"

আমার পরিচারিকা আসিল। আমি তাহার হাতে একটি 'আঠ্-আন্নী' দিয়া বলিলাম,—"যা, সারেঙীকে দিয়ে আয়।"

সারেঙী তখনও তন্ময় হইয়া বাজাইতেছিল। কি সুরের দোল—কি ঝঞ্চনা—রুদ্ধ-যাতনার রুদ্ধ-নিশ্বাস হা হা করিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। একবার মনে হইল—ডাকি। পরক্ষণেই ভাবিলাম, অমাত্য কি মনে করিবেন। আত্মহারা হইয়া তাহার তন্ত্রীর প্রত্যেক মীড়্ শুনিতে লাগিলাম। আমার প্রাণের ভিতরও একটা অব্যক্ত সুর খেলা করিতেছিল! সেও যেন,—বহুদিন ধরিয়া সেই কাহাকে

"খোজ করত বহ বার বার"

কিন্তু তনুবনে এখন আর সে ফুলের সৌরভ ত নাই। আমি অমাত্যের মুখে পানপাত্র তুলিতে ভুলিয়া গেলাম।

তিনি গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন—"রুমিয়া!"

পরিচারিকা সারেঙীর হস্তে 'আঠ্-আন্নীটি' দিল। সারেঙী খোদাতাল্লার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমি দূর হইতে তখনও তাহার রাগিণী শুনিতে পাইতেছিলাম। নির্ণিমেষ-নেত্রে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সুর শূন্যে মিলাইয়া গেল।

গুল্ ফিরিয়া আসিল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—গুল্ আমার বাল্য-সঙ্গিনী। স্বামী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু সে আজও আমায় ছাড়িতে পারে নাই। বোধ হয়, এই পাপিষ্ঠার জীবন-ইতিহাসের পূর্ব্বপৃষ্ঠার সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য বিধাতা কেবল এই গুল্‌কে এখনও কালের ঝঞ্ঝায় ঝরিয়া পড়িতে দেন নাই।

(৪)

সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গিয়াছে—সারেঙী আসিল না। কেন জানি না, অহর্নিশি প্রাণের ভিতর কেন সেই রাগিণী আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিত! একদিন সন্ধ্যায় জানালার পাশে একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম।—কত কথাই না মনে হইতেছিল! বোধ হয় জীবনের পরিণাম ভাবিতেছিলাম!—সব অন্ধকার!

নাঃ—চিন্তা মোটেই ভাল লাগে না। চিন্তা অসহ্য! চিন্তা করিয়া করিব কি? সারঙ্গ লইয়া গাহিতে বসিলাম। ভাল লাগিল না। গলাটা কাঁপিয়া উঠিল। কি এক অজানা আকর্ষণ কণ্ঠ চাপিয়া বসিল। সারঙ্ বেসুরা বলিতে লাগিল, গাহিতে পারিলাম না। আমার মনের অলক্ষ্যে কেবল অস্ফুটস্বরে গাহিলাম—

"খোজ করত বহু বার বার
তনবন ফুল্যো ডার্ ডার্"

বার বার সেই কলিটা গাহিতেছিলাম। এমন সময় হাসিতে হাসিতে গুল্ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমার মুখে তখনও সেই কলিটা লাগিয়া রহিয়াছিল।

গুল্ বলিল,—"কই—সে সারেঙী ত আর আসে না?"

আমি বলিলাম,—"না, সে ত অনেক দিন হয়ে গেল। কেন—তার কি হয়েছে বল্ দেখি?"

"ভিখিরী মানুষ, হয় ত বা কোথায়ও গিয়ে থাক্‌বে।" পাঁচ বাড়ী ঘুরে বেড়াতে হয় ত!"

তার পর আবার সেই শুভ্র জ্যোৎস্না—নক্ষত্রখচিত বিভাবরী। আমার পাশে অমাত্য বসিয়াছিলেন। একদিকে প্রাণের ক্ষুধা, অন্যদিকে সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রতিহিংসা অহরহ আমায় জ্বালাইয়া পোড়াইতে লাগিল।

সহসা দূরে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া সারেঙী গাহিল :—

"তুঝ্‌সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া
যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
এক্ তুঝ্‌কো আপনা পায়া
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়॥"

আমি স্তব্ধ হইয়া গানটি শুনিলাম। তাহার সমগ্র প্রাণের বেদনাপ্লুত মূকভাষা যেন সঙ্গীতের প্রত্যেক রাগ ভঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দিতেছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম—"গুল্! গুল্!"

গুল্ আসিল। আমি সেদিনকার মত আজও তাহার হাতে একটি 'আঠ্-আন্নী' দিয়া বলিলাম,—"যা, সারেঙীকে দিয়ে আয়।"

গুল্ চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলাম,—"তা'কে বল্‌বি, সে এতদিন আসে নি কেন? আমি তা'র গান শুন্‌তে বড় ভালবাসি—সে যেন আসে।"

গুল্ চলিয়া গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ পুনরায় তাহার মনোরম সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে শুনিলাম, সারেঙী বলিতেছে,—"তুমার দাতা ধনিককে বলিও, আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই—এবার আসিব।"

এই বলিয়া পুনরায় গান করিতে করিতে সে চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া জানালার পার্শ্বে গেলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুধু দূর হইতে শুনিতে পাইলাম,—

"তুঝ্‌সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া,
যো কুচ্‌ হায় সো তুহি হায়।"

(৫)

আর এক কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গেল—সে আসিল না। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, আমি কান পাতিয়া বসিয়া থাকিতাম, তবু সে আসিল না। আমার প্রাণের সমস্ত রুদ্ধ সুর যেন জমাট বাঁধিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল—তবু সে আসিল না!

আমি পীড়িতা হইয়া পড়িলাম। দুর্ব্বল—বেদনাপ্লুত দেহভার লইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। তবু কেবল তাহারই কথা মনে হইত—কই সে ত আসিল না!

এই বিশ্ব-সংসারে একাকিনী আমি—আমার আপনার বলিতে ত কেহ ছিল না। একাকিনী শুইয়া শুইয়া কত কথাই মনে পড়িত, কিছুই ভাল লাগিত না। কিন্তু কেন জানি না, সর্ব্বদাই সারেঙ্গীর কথা মনে পড়িত! সন্ধ্যা আগত হইলেই প্রাণটা যেন কেমন সাড়া দিয়া উঠিত! বুঝিতে পারি নাই কেন—কেমন করিয়া—কোথা হইতে এই দরিদ্র ভিখারী উদ্‌ভ্রান্ত গায়ক আমার নিভৃত চিত্তের অন্তরালে গিয়া কিসের যবনিকা সরাইয়া দিতেছিল। অথচ আমি তখন ভাবিতেছিলাম, কেমন করিয়া এ জ্বালা আমার মিটিবে।

দেখিতে দেখিতে আবার শুক্লপক্ষের আবির্ভাব হইল—আবার চন্দ্রোদ্ভাসিত রজনী পৃথিবীর বিশুষ্ক বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। আমি উন্মুক্ত বাতায়নের পাশে গালিচা পাতিয়া বসিয়া ছিলাম।

গুল্‌ ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বহিনী! সেই সারেঙ্গী এয়েছে।"

আমি শুনিলাম—

"ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা—"

গুল্‌ সারেঙ্গীর হাতে তাহার যথারীতি প্রাপ্য দিয়া বলিল,—"আবার এসো। মনিবের বড় অসুখ করেছিল,—তিনি সর্ব্বদাই তোমার গান শুন্‌তে চাইতেন।"

"তিনি এখন কেমন আছেন?"

"একটু ভাল।"

"খোদা তাঁকে আরোগ্য করুন। আমি আবার আসিয়া গান শুনাইব।"

আমি অতিকষ্টে জানালার শিক্‌ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। দূর হইতে গৌরবর্ণ অতি দীর্ঘকায় শ্মশ্রু-বিলম্বিত বৃদ্ধ সারেঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম। সে তখনও গাহিতেছিল:—

"ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা—"

(৬)

বৈশাখী পূর্ণিমা। দূরে পশ্চিমাকাশে মেঘ দেখা যাইতেছিল। আমি তখন সারিয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু তবু যেন আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুরন্ত হাওয়া চারিদিকে হা-হুতাশ করিতেছিল। সে দিনও অমাত্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন। আমি মেঘমল্লার গাহিতেছিলাম—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—
পৃথিবীয়ান্ অব্ বাদেরা হো।
চন্দ্রসুধাংশু মেরা, রস রঙ্গিলা
অব্ বাদেরা হো॥"

নীলাঞ্জন পিঙ্গলবরণ নভে আরও ঘোর করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অমাত্য স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। এমন সময় গুল্ আসিয়া আমার কানের কাছে কহিল,—"সারেঙী।"

নিমেষে আমার সমগ্র চিন্তা জানালাব পথ দিয়া রাজপথের দিকে ধাবিত হইল। আমি শুনিতে লাগিলাম। সারেঙী শুধু বাজাইতেছিল—তাহার কণ্ঠে আজ গান নাই! তাহার যন্ত্র আমার গানের সহিত সুর মিলাইয়া বাজিতেছিল! আমি তখনও গাহিতেছিলাম—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—
পৃথিবীয়ান্ অব্ বাদেরা হো॥"

সঙ্গীত থামিল, কিন্তু তাহার সারঙ্গ থামিল না! অমাত্য নির্ব্বাক্ হইয়া ঐ দূরাগত তারধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।

আমি উঠিয়া মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলিকাবৎ ঐ ধ্বনির অনুসরণ করিলাম। উন্মুক্ত জানালা দিয়া একবার দূরে ঐ রাজপথের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নিম্নে বসিয়া নতমস্তকে বৃদ্ধ তন্ময় হইয়া সারঙ্গ বাজাইতেছে।

আমার পার্শ্বে গুল্ দাঁড়াইয়াছিল। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ডাকিয়া আনিব?"

আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম—"হু"। গুল্ দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। সারেঙী তখনও বাজাইতেছিল—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—"

গুল্ সারেঙীকে নীচের ঘরে উপবেশন করিতে বলিয়া আমায় আসিয়া সংবাদ দিল।

আমি নীচে গেলাম। আমার পদশব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। আমাকে কুর্নিস করিয়া অতি বিনীতস্বরে কহিল—"বিবিসাহেবা! আপনি আমায় দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহা আপনার বিশেষ মেহেরবাণী! আমি আশা করি, আপনি ভাল—"

কি কণ্ঠস্বর! তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পুর্ব্বেই আমি তাহার চক্ষের দিকে চাহিলাম। কি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চক্ষু! সে চাহনি যেন আমার চোখের ভিতর দিয়া আমার প্রাণের শেষ রেখার লেখা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল।

আবার সারেঙী আমার দিকে চাহিল। সহসা তাহার দৃষ্টি আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সে বিস্ফারিত নয়নে আবার আমার প্রতি চাহিল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! সে চাহনি, সে কম্পন দেখিয়া আমি ভীত ও বিস্মিত হইলাম!

এমন সময় অমাত্য আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের চারিচক্ষুতে মিলন হইল। অমনি সারেঙীর চক্ষু যেন আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল! অমাত্য সে রক্তবর্ণ আঁখি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সারেঙী অকস্মাৎ হিংস্র ব্যাঘ্রের মত অমাত্যের স্কন্ধদেশে লাফাইয়া পড়িল।

নিমেষে অমাত্যের ছিন্নবক্ষ প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! শুধু অস্ফুটস্বরে একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। সারেঙী গম্ভীরস্বরে ডাকিল—"রোশেনা!"

আমার চমক ভাঙ্গিল! সেই ত সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু আমি কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে শুধু বলিলাম,—"তু—মি!"

তিনি আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তস্থিত সারঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়িল। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

আমি ছুটিয়া গিয়া আমার ক্রোড়দেশে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলাম। আমার হস্ত লাগিয়া তাঁহার কৃত্রিম পক্ক গুম্ফ-শ্মশ্রু খসিয়া পড়িল!

আমি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"গুল্!"

গুল্ ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তার বহুপূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত আকাশে উড়িয়া গিয়াছিল!

আমার কিছু মনে ছিল না। ঘোর কাটিলে দেখি, আকাশ ঘন ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন; ঝর ঝর ধারা অবিরাম বর্ষণে ঘননিশার আঁধারকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। বিজলীর তীব্র কশাঘাতে দীর্ণ আকাশের চকিত-চঞ্চল আলোকে হেরিলাম, দুই মৃতদেহের মাঝে ছিন্নতন্ত্রী রক্তাক্ত সারঙ্গটি ধূলায় পড়িয়া আছে। সে তখন মৌন, কিন্তু বিশ্বব্যাপিয়া সেই জলধারার সঙ্গে সঙ্গে মেঘমল্লারের সুরধারায় "অব বাদেরা হো! অব্ বাদেরা হো!"

আমি সেই অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শ্রীঅবনীকুমার দে।

নিবেদন

(বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় দেশজননীকে নিবেদন উপলক্ষে)

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, সে দিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সে দিন যে মানস করিয়াছিলাম, এত দিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলাটো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল, এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ্‌-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য-সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবান্‌-চন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন-শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান-কার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র-নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথ-প্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এত দিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্ম্মাণীতে

আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিক্রিয়া-সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সে দিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাতকারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখা-ভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মতবিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই এক জন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল।

যাঁরা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন, তাঁহারই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে

নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী-পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম,—উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশবক!" জানিতে পারিলাম, সেই দিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মন্টেগু। ইহার পর ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ফিলাডেল্‌ফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্ম্মাণ অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।

সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, এ সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, "সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।"

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবনপণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোন দিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্ত তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্রিত এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণীর আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে, তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্ত, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল, তাহা দৃষ্টিগোচর

করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক-সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণ-কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুত-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্ব্বাণ জীবনের বেদনা-চাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রাপরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষপ্রয়োগ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসব ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহুশাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার-নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানবিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিজ্ঞজনমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসবলেই চিরজীবন চলিয়াছি, ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া

কোন দিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পর-পারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল, বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয় ত, দেখিতে পাইব যে এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক্ আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার, ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নূতন তত্ত্বপ্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এ স্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এ স্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতি—সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেন্ট লওয়া হইবে না; কারণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক্ আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে—যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদ্‌জগতে এই তূষ্ণীভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতি-শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর? কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিকদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সে সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়-

সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশবিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান-প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল—যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলকমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, "এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।"

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব-অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে, এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম। কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে; কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

"THE BRAHMUNICAL MAGAZINE" (·1821-23)

এবং (NO. I—IV)

"VAIDANTIC DOCTRINES VINDICATED" (1845)

(NO. I—IV)

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ পর্য্যন্তও আমাদিগকে প্রকাশ্যে জানাই-লেন না যে, V. D. V. গ্রন্থের রচনায় রাজনারায়ণ বাবুর নাম তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এত বড় একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক ভুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে, সংস্কারযুগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তনের ইতিহাস লেখককে প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের আছে। তিনি যদি নীরব থাকেন, তবে তাহাতে কলরব কিঞ্চিৎ বাড়িবে মাত্র, কেন না—ইহা সম্ভবতঃ রাত্রি-প্রভাতের সময়। আর সত্য, অন্ধকার হইতে আলোতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা জানেন।

আমি V D. V. গ্রন্থের আলোচনায় বলিয়াছিলাম যে, রাজা রামমোহন রায় ১৮২১—২৩ খৃঃ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সহিত বেদান্ত লইয়া যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, The Br. Magazine (I—IV) যাহার সাক্ষ্য ও সাহিত্য, ১৮৪৫ খৃঃ ডফের সহিত তত্ত্ববোধিনীর যে বেদান্ত-যুদ্ধ হয়, তাহা সেই রামমোহনের প্রথম বেদান্ত-যুদ্ধেরই দ্বিতীয় সংস্করণ বা অনুকরণ। আর আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, V D V. প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে তত্ত্ববোধিনী ডফকে যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহাতে রামমোহনের The Br. Magazine চতুষ্টয়কে "অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়া" ছিলেন।

ভারতী শ্রাবণ, ১৩২৪ বলেন যে, (১) "লেখকের (অর্থাৎ আমার) এই সমস্ত কথাগুলিরই কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।" (২) "V D. V. রামমোহনের Br. Magazine কে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরে নাই।"

আমি সবিনয়ে এই কথা নিবেদন করিতে চাই (যাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি) যে, V. D. V. বস্তুতঃই Br. Magazineকে "অক্ষরে অক্ষরে" তুলিয়া ধরিয়াছে, এবং আমার এই কথার যে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তাহাও যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ আমি প্রদর্শন করিব।

(ক) আমাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মের উপরেই গত শতাব্দীর সংস্কার-যুগের খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম পাদ্রীদের চোট ও ঝাল একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা এবং তদনুকরণে ডফ্ সাহেবও এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ধারণাই সম্ভব নয়,—ইহা নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র, ইহার উপাসনা চলে না, যে হেতু, এই ব্রহ্ম উন্নতিশীল (progressive ?) নহেন, কাজেই ইঁহার উপাসনায় কোন সামাজিক উন্নতি বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়, ইহাতে কোনরূপ উন্নত নীতিবোধের অবসর নাই, পরন্তু ইহার উপাসনায় সমাজে বহুতর দুর্নীতিই প্রশ্রয় পাইতে পারে—ইত্যাদি, এবং—ইত্যাদি।

নির্গুণ ব্রহ্ম, সম্ভবতঃ অনেক দিনের প্রাচীন, এবং স্মরণাতীত কাল হইতে বহুশতাব্দীর এবংবিধ বহুপ্রকার উৎপাতের মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি বোধ করি নিজ সত্তা অব্যাহত রাখিয়াছেন। আর তা যদি রাখিয়া থাকেন, তবে গত একশবছরের কতিপয় বিদেশী খৃষ্টান আর স্বদেশী ব্রাহ্ম মিলিয়া তাঁহার পঞ্চত্ব ঘটাইয়াছেন, এমন কথা, আমি ত বিশ্বাস করি না।

তা যাই হউক, শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের আক্রমণের উত্তরে রাজা রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের গুণবিচার লইয়া এক গবেষণা করেন। তিনি বলেন, মনুষ্যের যেরূপ রাগ, দ্বেষ, জ্ঞান, অনুকম্পা প্রভৃতি গুণ আছে, ব্রহ্মে সেরূপ সম্ভব নয়, এবং তাহা নয় বলিয়াই মনুষ্যভাবে ও ভাষায় বলিতে গেলে ব্রহ্মকে নির্গুণই বলিতে হয়। Br. Magazine IV—তে এই সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে, এবং সে গ্রন্থ যাহার আছে, তিনি তাহা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন।

ইহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে মহাত্মা ডফ্‌ও শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের কথাগুলিই খোঁচাইয়া তুলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকে আক্রমণ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী V. D. V. প্রথম প্রবন্ধেই আবার তাহার জবাব দিলেন। সে কি প্রকার? একেবারে—Br. Magazine IVএর যুক্তি ও উক্তিগুলি "হুবহু নকল" (যে কেহ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন) করিয়া। যখন তাহাতেও কুলাইল না, তখন V. D V. No I (page 4) বলিতেছেন—"In corroboration of the above truths, we subjoin the following extracts *from the Br. Magazine No IV*" যথা—

"The Vaidanta does not ascribe to God any power or attribute according to the human notion of properties * * * etc. world."

অর্থাৎ—V. D. V. প্রবন্ধের পহেলা নম্বর তুলিয়া ধরিলেন The Br. Magazine চারের নম্বরকে এবং "অক্ষরে অক্ষরে"। কি, না?

(খ) সেকালে পাদ্রী ডফ্ স্বয়ং এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, তত্ত্ববোধিনী কেবল

রাজা রামমোহন রায়ের একপেশে বেদান্ত-দর্শনের মীমাংসা তুলিয়া ধরিয়া তর্ক করিতেছেন। (*) তদুত্তরে—V. D. V. প্রবন্ধের দোসরা নম্বরের রচয়িতা, কোন লজ্জা ত অনুভব করিলেনই না, অস্বীকার করা ত দূরের কথা—পক্ষান্তরে, অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিয়া বলিলেন যে, পাদ্রীবন্ধুকে ধন্যবাদ; যেহেতু, রাজা রামমোহনের লুপ্তপ্রায় পবিত্র স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাহাদিগকে (তত্ত্ববোধিনীকে) এক সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। † তার পর, রামমোহনের বেদান্ত-মীমাংসা যে একপেশে নয়, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য V. D. V. No IIর রচয়িতা কি করিলেন? তিনি বলিলেন যে, "আমরা রাজা রামমোহন রায়ের নিজের কথাই তুলিয়া ধরিয়া আমাদের পাদ্রী বন্ধুর কথার জবাব দিব।" ‡ এবং অনন্তর এই কথা বলিয়া V. D. V. রচয়িতা—ঠিক তার আড়াই ছত্র পরে রাজা রামমোহন রায়ের Br. Magazine No IV হইতে ২৮ ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নিতান্তই "অক্ষরে অক্ষরে।" যথা—"These as well as several other texts etc * * love etc." পাদ্রীরা বলিয়াছিলেন যে, বেদের মধ্যে যে সূর্য্য, অগ্নি এবং এমন কি, চতুষ্পদ জানোয়ার প্রভৃতির পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়, রামমোহন শাস্ত্রবাদী হইয়া সে সকলের উত্তরে কিছুই বলেন না কেন? তজ্জন্য তাঁর বেদান্ত-মীমাংসা একপেশে মীমাংসা। বস্তুতঃ রাজা রামমোহন নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নাধিকারীর জন্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্যরূপ উপাসনার সম্বন্ধেও একটা মীমাংসায় আসিয়াছিবেন। V. D. V. রচয়িতাও রামমোহনের মীমাংসাকেই শিরোধার্য্য করিয়া Br. Magazine No IV হইতে ২৮শ ছত্র উদ্ধার করিয়া পাদ্রী ডফের জবাব দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, রামমোহনের বেদান্ত-মীমাংসাকে একপেশে বলা পাদ্রীদের পক্ষে নিতান্তই ভ্রম। ¶ এখন V. D. V. এর দোসরা নম্বরের প্রবন্ধও যে Br. Magazineএর চারের নম্বরের প্রবন্ধকে তুলিয়া ধরিল, এবং ইহাও "অক্ষরে-অক্ষরে" কি, না?

* "Advocating Rammohon Roy's one sided view of the Vaidant system of Hindu Philosophy" V. D. V. No II, page 16-17.

† "We thank our friend for the opportunity thus afforded us of redeeming the sacred memory of the deceased Philosopher (Raja Rammohon Roy) from the obloquy which has thus been cast upon it"

‡ "We shall meet our friend with Rammohon Roy's own words" V. D. V, No II page 17

¶ It is totally, gratuitous, therefore to maintain that he (Ram mohon) has taken an one-sided view of the Vaidantic doctrines"
V. D. V. No:II page 18

(গ) V. D. V. No III, প্রবন্ধের তেসরা নম্বর দেখা যাক্। এই তেসরা নম্বরও সেকালের সিডিসন (sedition) হইতে গলা বাঁচাইবার জন্য, আর কেহকে নয়, সেই Br. Magazine এর গলাই জড়াইয়া ধরিয়াছিল। পাদ্রীরা চার্জ্জ দিয়াছিলেন, এই যে রামমোহন এবং তত্ত্ববোধিনী উভয়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে বাহ্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে—ইহা কপটতা-পূর্ণ, এবং ইহা তাহাদের ভণ্ডামী মাত্র। তখন—V. D. V. No III page 24-25 অতি স্পষ্টাক্ষরেই Br. Magazine কে অনুসরণ ও তাহার 'অক্ষর' উদ্ধার করিয়া রাজদ্রোহিতার—অভিযোগ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। V. D. V. এর তেসরা নম্বরের প্রবন্ধের ২৪ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা অবলোকন করিলেই আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কেননা, ঐ সমস্ত পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্য ওই সমস্ত কথাই ছাপার অক্ষরে লেখা আছে।

আমি আর ঘাঁটাইব না। যাহা উপরে উদ্ধার করিয়া দেখান হইল, আমার বিশ্বাস, তাহার দ্বারা সুধী পাঠকবর্গকে বুঝিবার জন্য যথেষ্ট অবসর দেওয়া হইল যে—

(১) "V. D. V. রামমোহনের—Br. Magazine কে অক্ষরে অক্ষরে (ই) তুলিয়া ধরিয়াছে।" এবং—

(২) "লেখকের (অর্থাৎ আমার) কথাগুলির ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।" এবং—

(৩) ভারতীর সমালোচক, যাহা সত্য নয়, তাহাই বলিয়াছেন।

ভারতীর সমালোচক বলেন যে, "V. D. V. রামমোহনের Br. Magazine এর ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শনাদির বিচার ইহাতে আদৌ নাই।"

সত্য কথা। স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন নাই?

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা হিন্দুর ষড়্‌দর্শন হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, হিন্দু দর্শন বা শাস্ত্রাদির অভিপ্রায়ানুসারে এক নিরাকার পরব্রহ্মই উপাস্য নহে। রাজা রামমোহনকে কাজেই তাহার উত্তরে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কেননা, শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা শুধু বেদান্তকে ত আক্রমণ করেন নাই। ডফ্ আক্রমণ করিয়াছিলেন, শুধু বেদান্ত-দর্শনকে। কাজেই তত্ত্ববোধিনী বেদান্তমত-সমর্থনের জন্যই কোমর বাঁধিয়াছিলেন। কাজেই প্রবন্ধগুলির নামও হইয়াছিল "Vaidantic Doctrines Vindicated।" এবং সেই জন্যই ন্যায় সাংখ্যের গবেষণা ইহাতে আসে নাই, এবং তত্ত্ববোধিনী বেদান্তমত-সমর্থনে রামমোহনের Br. Magazine এর বেদান্তমত-সমর্থিত যুক্তি ও উক্তিগুলিই 'হুবহু নকল' বা "অক্ষরে অক্ষরে" তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। যদি ডফ্ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের মত,

স্থায়, সাংখ্য প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনগুলিকেও আক্রমণ করিতেন, তবে আশা করা যায়, তত্ত্ববোধিনী তাহার উত্তরে—Br. Magazineএর স্থায়, সাংখ্যের গবেষণাই তুলিয়া ধরিতেন, যেমন বেদান্তমত তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এত তলাইয়া পড়ে কে? যদি না পড়িয়া এবং আলোচ্য গ্রন্থ না দেখিয়াও ৭৪০ পৃষ্ঠার জীবন-চরিত লেখা চলে, এই দ্রুত উন্নতিশীল বঙ্গ-সাহিত্যে—? এবং এই আজিকার দিনে?

ভারতীর সত্যব্রতধারী সমালোচক যে কে, তা পাঠকবর্গও জানেন না এবং আমিও জানি না। কেননা, তিনি বেনামী। তিনি, দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত-লেখক অজিতবাবুর পক্ষ হইয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, অজিতবাবু V. D. V. গ্রন্থখানি দেখেন নাই। উত্তম কথা, কেহ ত কখনো বলে নাই যে, অজিতবাবু এ গ্রন্থ দেখিয়াছেন। কিন্তু সমালোচক আবার সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ "আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের কাছেই আছে।" এও ভাল কথা। তবে Br. Magazine এর দেখা বা না দেখা সম্বন্ধে তিনি এ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নাই। আশা করা যায়, হয় ত পরে দেখিয়া বলিবেন। আমাদেব ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই হয় যে, আলোচ্য গ্রন্থগুলি দেখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্ষতি কি? একটা প্রথা যখন আছে, মানিয়া চলাই ভাল।

ভারতীর বেনামী সমালোচক আমাকে "বালক" "জ্যাঠা" প্রভৃতি আরো গুরুতর কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভাষণে সম্মানিত করিয়াছেন। ইহা আমার অতিশয় মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে, যে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য উদ্ঘাটনে সে সত্য দোষই হউক আর গুণই হউক, তিনি একটু অধিক মাত্রায় গাত্রদাহ অনুভব করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ এবং সেই প্রসঙ্গে রামমোহনের আলোচনায় আমার অধিকার সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন ও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিবেদন করি, এবং খুব স্পষ্ট করিয়া, যে অযোগ্য অনধিকারী দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন, বঙ্গসাহিত্যে আলোচনার সূত্রপাত দেখিয়াই মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এ বিষয়ে দুঃসাহসী হইয়াছে। আর ইহাও বিবেচনায় আইসে যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের পুত্র বা তথাকথিত ধর্ম্মপুত্রগণ থাকিলেও এই সমস্ত শক্তিশালী মহাপুরুষগণ কেহর পিতার জমিদারী নহেন, বা কেহ ইহাঁদিগকে ইজারা লইয়াছেন, এমত সংবাদও এতাবৎ প্রাপ্ত হই নাই। পক্ষান্তরে, ইহাঁরা বে-ওয়ারীশ মালও নহেন। ইহাঁরা জাতীয় সম্পদ্ ও সম্পত্তি। সেই হিসাবে ইহাঁরা আমাদের প্রত্যেকের পূজ্য, অথচ সম্পূর্ণ বিচারাধীন।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রে "আমার ধর্ম্ম" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা আমাদেরই "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধটির জবাবস্বরূপ লেখা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে ভাবে বুঝিয়াছি, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কি অভিমত, তাহা জানিবার জন্য আমরা স্বতঃই উৎসুক ছিলাম, তাই বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তবুও দেখিতেছি, আমাদের ধারণা কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। এমন কি, বর্ত্তমানে তিনি যে রাষ্ট্রনীতির সঙ্কুল যুদ্ধে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আমাদের ভুলটি ধরিতে পারিতেছি না। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের মনে হইল, রবীন্দ্রনাথ যেন ক্ষুব্ধ হইয়া একটু অভিমান করিয়াই লিখিয়াছেন। তিনি যেন বলিতে চাহেন, "আমি ত শক্তিকে কোনদিন অবহেলা করি নাই, আমি ত কত শক্তিমন্ত্র গাহিয়াছি, রুদ্রের বন্দনা আমার সাধনায় যে কিছু কম, এমন নয়, তবুও কেন লোকে বিপরীত কথা বলে? আমার ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম স্বীকার করিলাম; কিন্তু সে শান্তি আমি চাহিয়াছি শক্তিরই পরিণতিরূপে, ক্লীবের জড়ের যে শান্তি, জগতের জীবনের দ্বন্দ্বকে কোনরূপে, ফাঁকি দিয়া যে শান্তি, সে শান্তির ত আমার ধর্ম্মে কোন স্থানই নাই, তবুও কেন এ অখ্যাতি?" "তবুও কেন," এই কথাটিই আজ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্মটা কি,—তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আমরা তাঁহার প্রেতাত্মাটিই বাহির করিয়া ফেলিয়াছি। কারণ, কোন মানুষের কি ঠিক ধর্ম্ম, তা তার শেষ অভিব্যক্তিটি না দেখিলে আগে হইতেই কি করিয়া বলা যায়? জীবনের সাধনার অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত যে সত্য পাইয়াছি, সেখানে আসিয়াই থামিয়া যাই নাই, তাহাই ত আমার শেষ কথা নয়। খাঁটি ধর্ম্মটি জানিতে হইলে শেষ উপলব্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই ন্যায়সঙ্গত—নতুবা মানুষের উপর অবিচারই করা হইবে। এ আপত্তির উত্তর দেওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথ এ আপত্তি তুলিয়াছেন, শুধু আপত্তি তুলিবার জন্য—এ কথা একটু পরে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, মানুষের শেষ অভিব্যক্তি—শেষ উপলব্ধি কবে কোথায়? ঠিক মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে? কিন্তু মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ত অভিব্যক্তির অবসান হয় নাই। এ জীবনের পরে আরও কত জীবন ধরিয়া তাহার নূতন নূতন উপলব্ধি ফুটিয়া উঠিতেছে—তবে শেষ কথা পাইব কবে? তবে ত মানুষকে চিনিবার ধরিবার কোন উপায়ই কোন কালে নাই।

সে যাহা হউক, তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এই তাঁহার শেষ কথা কি না জানি না, কিন্তু শেষ কথা হউক আর না হউক, আমরা তাঁহার যে ধর্ম্মটি নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম, তাহা এ রকম কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, এ রকম শেষ কথার উপর নির্ভর করে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, তিনি কি হইতে চাহেন, তাঁহার নিজের সাধনার লক্ষ্য কি, আমরা কিন্তু দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ কি হইয়াছেন, জগৎকে তাঁহার কি দেওয়ার আছে। রবীন্দ্রনাথ খুঁজিতেছেন, তাঁহার বুদ্ধির ধর্ম্ম, আমরা দেখাইয়াছি তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম। বুদ্ধির ধর্ম্মটি তাঁহার অন্তর-জীবনের জন্য, তাহার ব্যক্তিগত সাধনার জন্য তাঁহার কাছে বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে যে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত,তাঁহার যে ভাগটির সহিত জগৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছে, যেটুকু স্থায়ী সত্য সম্পদ তাহা হইতেছে তাঁহার এই প্রাণের ধন—সেই সত্যটি যাহার সত্যতা কেবল বুদ্ধি দিয়াই উপলব্ধি করেন নাই, কিন্তু যাহা তাঁহার অন্তরাত্মা হইতেই উৎসারিত হইতেছে। আমরা দেখাইতে চাহিয়াছি, তাঁহার অধিগত তাঁহার লব্ধ বস্তুটি, তাঁহার প্রাণের উপলব্ধি আর তাহা হইতে কোন্ তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িতেছে, শুধু তাঁহার কথায় নয়, তাঁহার কার্য্যেও নয়, কিন্তু কথার কার্য্যের ভাবে, তাঁহার দৃষ্টির মৌলিক ভঙ্গিমায় কোন্ তন্ত্র, কোন্ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে।

তাই আমরা আবার বলি, শক্তি জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের বাঞ্ছনীয় বস্তু হইতে পারে, উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিতে পারে, তিনি শক্তির সাধক হইলেও হইতে পারেন—কিন্তু শান্তি কোমলতা জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের লব্ধ অধিগত সহজাত বস্তু, এখানে তিনি একেবারে সিদ্ধ। তাই প্রেম-প্রীতির কথা, সুষমা-সামঞ্জস্যের কথা তাঁহার মুখ হইতে যেমন একটা সহজ সত্যে ভরিয়া বাহির হয়, দ্বন্দ্বের কথায়, বিক্রমের কথায় তেমনি একটা কৃত্রিমতা অথবা অবাস্তবতার আভাস রহিয়াই যায়। একটির মধ্যে পাই অযত্নসুলভ সারল্য ঋজুতা, আর একটির মধ্যে পাই চেষ্টা, কষ্টকল্পনা। একটি আপনা হইতেই তাঁহার ভিতর হইতেই অবাধে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে, আর একটিকে কেমন জোর-জবরদস্তি করিয়া তবে আনিতে হয়। বুদ্ধির ধর্ম্মের উপর প্রাণের ধর্ম্ম সর্ব্বদাই টেক্কা দিয়া চলে, ইহার আর ব্যতিক্রম নাই। তাই কখন দেখি, রবীন্দ্রনাথ যেখানে শক্তির কথা বলিয়াছেন, সেখানে রহিয়াছে কেমন একটা বাগাড়ম্বর, একটা আতিশয্য—ভিতরে যাহার অসদ্ভাব, তাহাকে সম্মুখে বিরাট্ বিপুল করিয়া না ধরিতে পারিলে যেন তাহার সত্তা সত্যতা সম্বন্ধে স্থির আশ্বস্ত হইতে পারি না। আবার কখন দেখি, শক্তির কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু এমন মোলায়েম করিয়া, মনোলোভা করিয়া যে শক্তির শক্তিত্ব সেখানে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেন রুদ্রের বিকট বীভৎস

মূর্ত্তির সম্মুখে পড়িয়া অজানিতেই তাঁহার প্রাণের নিগূঢ় তন্ত্রীটা কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাই সে যেন ডাকিতেছে—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্", হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, সেইটিই দেখাও, সেইটি দিয়াই আমাদিগকে সতত রক্ষা করিও। এতগুলি কথায় সে ভাব তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথায় না বলিয়া থাকিলেও ভঙ্গিমায় তাহা আমরা স্পষ্টই যেন ধরিতে পাই। বস্তুতঃ শক্ত কথা বলাতেই শাক্তের পরিচয় নয়, নরম কথাও শক্তভাবে বলিতে পারাতেই শাক্ত ধর্ম্মটি আরও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের সকল শক্তি বীর্য্য যুদ্ধ বন্দনার পশ্চাতে কেমন একটি ভাব রহিয়াছে যে, এ সকলকে কোনরূপে কাটাইয়া উঠিতে হইবে—সংঘর্ষের মধ্যে দিয়াই শান্তিতে পৌঁছিতে হইবে, মৃত্যুর করাল বক্ত্রের ভিতর দিয়াই অমৃতত্বের রাস্তাটি প্রসারিত—ইহার অন্যথা হইবার নয়। কিন্তু তাঁহার প্রাণটি চাহিতেছে যত শীঘ্র এ রাস্তাটি পার হওয়া যায়, এক চুমুকেই যদি সকল বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হওয়া যায়! রুদ্রের দক্ষিণ মুখটি তিনি কখন ভুলিতে পারিতেছেন না, উহাকে সম্মুখে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াই তিনি সে ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলিয়াছেন। রুদ্রের যে বাম মুখটি, তাহার প্রতি তিনি যেন বাম হইয়াই চলিয়াছেন। তিনি যতই বলুন না, "ওগো মরণ, হে মোর মরণ"—তাহার মধ্যে আমরা অনুভব করি, মরণের সে সুখালিঙ্গন, কি একটা অজানা তৃপ্তি শান্তি। কিন্তু কই, পাই না ত মৃত্যুর মর্ম্মন্তুদ বেদনার তাহার মধ্যে একটা ঘোর কিছুর কোন আভাস! আমরা জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুর কি ঠিক ততটুকুই সার্থকতা—যতটুকু সে আমাদিগকে অমৃতের আস্বাদন দিতেছে, দ্বন্দ্বের ততখানি মর্য্যাদা—যতখানি আমাদিগকে শান্তির মধ্যে লইয়া চলিয়াছে? ইহাই কি ঠিক? ইহাই কি সব? আমরা ত স্বীকার করি, দ্বন্দ্বের পরিণতি শান্তি, মৃত্যুর লক্ষ্য অমৃত হইতে পারে, কিন্তু সত্য যিনি, শাক্ত যিনি, বীরকর্ম্মী যিনি দ্বন্দ্বকে দ্বন্দ্বরূপে ধরিয়াই একটা অপরূপ রসভোগ করেন, তাঁহার মধ্যে এ রকম কোন arriere pensée নাই যে, দ্বন্দ্বটা অতি প্রয়োজনীয় হইলেও সাময়িক, অনিত্য, ইহার মধ্যে গুরুতর সত্যীন কিছু নাই, মূলতঃ ইহা এক রকম ভুল বা মিথ্যা, ইহার পরে যে শান্তি, যে মিলন, যে সুষমা, তাহাই শাশ্বত সত্য সুন্দর মঙ্গল! এই arriere pensée টুকু নাই বলিয়া তিনি যে দ্বন্দ্বকেই, যুদ্ধকেই চরম বলিয়া ধরিয়া থাকিবেন, এমন কোন কথা নাই। তবে উহার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার কোন চাঞ্চল্য, কোন অসন্তোষ নাই, উহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার অধীরতা নাই, তাঁহার প্রকৃতি ঐখানেই যেন কি একটা চরম সার্থকতা লাভ করিতেছে; চরম শান্তি পাইলেও সে সার্থকতাটুকু কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে না, 'মায়া মু মতিভ্রমো নু' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। প্রেমের, সৌন্দর্য্যের ভগবান্ই সর্ব্বদা রহিয়াছেন, রুদ্র যাহা,

কুৎসিত যাহা তাহার পশ্চাতে—এই চিন্তাটুকু রবীন্দ্রনাথ কখনও দূর করিতে পারেন নাই। রুদ্রের মধ্যে, কুৎসিতের মধ্যে যে প্রেমময় সৌন্দর্য্যময় আত্মা রহিয়াছে, তাহাই খুঁজিয়াছেন, রুদ্রের রুদ্রত্ব, কুৎসিতের কুৎসিতত্বও যে সে আত্মারই অপূর্ব্ব প্রতিভা, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথে পাই না বীরসাধকের সে তপ্ততেজ। বীর কর্ম্মে তাঁহার মধ্যে পাই তিতিক্ষা, পাই একটা অনুমতি, কিন্তু পাই না জাগ্রত উল্লাস, পাই না কালীর অট্টহাস।

কালীর অট্টহাসে যে কি চরম সত্য, কি চরম রস, আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই তিনি আভাষে ইঙ্গিতে হাবে ভাবে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন কৃষ্ণের মোহন মুরলী। কৃষ্ণের মোহন মুরলীই চরম সত্য, সেটি যাহাতে পূর্ণতররূপে উপভোগ করিতে পারি, তার জন্য আগে শুনা প্রয়োজন কালীর অট্টহাস, কৃষ্ণকে পাইবার জন্য কালী পন্থামাত্র অথবা কৃষ্ণই আপনার মধ্যে কালীকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছেন—এ কথা আমরা মানি না। আমরা বলি, কৃষ্ণ কালী একই বস্তু, দুই নয়! কৃষ্ণকে ঘিরিয়া কালী, কালীকে ঘিরিয়া কৃষ্ণ।

শ্রী :—

গান

তাই মেতেছি রাসে,
রসে ভিজেছে মন, এ রূপ-বাসে
তোরই পিয়াসে রাধে, তোরি পিয়াসে।
রাধে রাধে ফুকারি এ বাঁশরী,
প্রাণ রন্ধ্র মাঝে পিরীতি মন্ত্র ভরি,
পিয়া পিয়া, পিয়া পিয়া, পিয়ারি আসে।
লাজ মান ভয়
সহজে না গেলে নয়,
সহজে জেনেছে সে, সহজে যে ভাল বাসে,
আমি অত ভাল বাসি,
রাধা কত ভাল বাসে।

শ্রী :—

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা] [পৌষ, ১৩২৪ সাল।

সাড়ে-তিন-হাত!

মা গো মা, বাঙলার মাটী
তুই বাঙালীর মা যে গো!
সেই বাঙালীর মা কি গো তুই
এই কাঙালীর মা গো!
চরণ-তলে, সাগর দোলে,
মাথার কেশে তুষার গলে,
গঙ্গা পদ্মা গর্জ্জে চলে,
বুকের আজ' কি দোল গো,
তবু তিমির 'পরে তিমির ঘিরে—
বাজের আগুন উড়্‌ছে গো!
গর্ভকোষে ধরেছিলি মা গো
তেঁই সে গর্ব্ব করি গো,
দিছিস্‌ নয়ন, অতুল রতন
প্রাণ ভ'রে রূপ হেরি গো!

চোখের আলোক নিভে গেছে আজ
রঙিন কাচের আলোয় দেখি,
তুই আজ আমার ছোট হলি মা গো!
'বিশ্ব' আমার বড় গো—
তোর মায়ের দুধে বিষ হয়েছে
হাড়িনীর দুধ মিষ্টি বেশী,
দুধ খেয়ে খেয়ে কালসাপ হয়ে
হয়েছি 'বিশ্ব-বেশী' গো!
সাড়ে-তিন-হাত জমি মেপে দিয়ে
দিছিস্ জন্ম দেশে গো!
কেউ, সাড়ে-তিন-হাত কেড়ে নিতে পারে,
জন্মে নি বিশ্ব-দেশে গো!
জন্ম-মরণ দোলায় আসি
গোলামের মত যাই গো!
তবু, সাড়ে-তিন-হাত কেড়ে নিতে পারে
কোন ভগবান্ আজি নাই গো!
সকল তীর্থময়ি মা আমার,
তুই মা কল্পবৃক্ষ গো!
আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
চতুর্ব্বর্গ ফল মা গো!
থাক্ সে 'বিশ্ব' বিশ্বের হাটে
মরণের নাট তুই মা গো!
এই সাড়ে-তিন-হাত ভিটায় যেন মা
জন্ম জন্ম জনমি গো!

শ্রীঃ—

দুর্ব্বাসার শাপ

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক দুর্ব্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্যন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব্ববিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সে কথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে। শকুন্তলা যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সঙ্গে বার বছরের ছেলে, তখন মনে সব ঠিক আছে, তবু রাজা বিবাহটা একেবার অস্বীকার করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নয়, শকুন্তলাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর ছেলেটাকে "হোঁৎকা" বলিয়া, "হাতী" বলিয়া গালি দিলেন। শেষ শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল যে, 'তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ।' লোকে দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোকলজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।

কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপ আনিয়া এই মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন কি, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। যখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি শকুন্তলাকে লইতে স্বীকার কেমন করিয়া করেন? যাহারা দেখিতেছে, তাহারা রাজার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতীহারী বলিলেন, 'আহা, আমাদের রাজার কি ধর্ম্মজ্ঞান! এমন রূপ! স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। মুখের কথায় আপনার হইয়া যায়। শুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহাকে লইতেছেন না।' শকুন্তলা যখন কপট শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন, 'তুমি ঘাসে ঢাকা কূয়া, ধর্ম্মের কাচ করিয়া বসিয়া আছ,' তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, 'দুষ্যন্তের চরিত্র'ত' আমরা সবাই জানি, তবুও তাঁহার ভিতর যে শঠতা আছে, কখন দেখি নাই।' যাঁহারা থিয়েটার দেখিতেছেন, তাঁহারা শাপের কথা জানেন। তাঁহারাও রাজার কোন দোষই দেখিতে পাইতেছেন না, বরং তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে দুষ্যন্তকে "কাপুরুষতার" দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে। অঙ্গুরী পাইয়াই রাজার যেমন সব কথা মনে পড়িল, অমনি তাঁহার ঘোরতর অনুতাপ হইল। প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, আর তাঁহাকে যেন সহস্র

বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই অনুতাপ, এই যন্ত্রণা, এই অধীরতায় রাজার চরিত্র বেশ খুলিতে লাগিল। বোকা বিদূষক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। যে সকল কথা এ সময়ে চাপা দেওয়া উচিত, বোকাটা সেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজার স্বভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিল কে? সানুমতী আর নাটকের প্রেক্ষককুল! এই সময়ে আবার সদাগরের মরার খবর আসিল। সে আঁটকুড়া ছিল, বিদূষক যে কথাটা মনে করাইয়া দেয় নাই, সেটাও মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, "আমি অপুত্রক" অথচ আমার পুত্র হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। আমি ছেলেটি হেলায় হারাইয়াছি! তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন; এতটা অধীর হইলেন যে, মাতলি তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই ভয় পাইলেন, ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় গেলে কোন কাজই পাওয়া যাইবে না। তাই বিদূষককে মারিয়া, রাজাকে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কণ্বের আশ্রমে প্রথম দেখার সময় সকলে রাজার ভাব দেখিয়াছেন। লতাকুঞ্জে গান্ধর্ব্ব বিবাহের সময়ও রাজার ভাব দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। বিশেষ নিন্দা করারও কিছু ছিল না। শকুন্তলাকে তাড়াইবার সময়ও তাঁহার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা আছে। রাজা চেষ্টা করিতেছেন, মনে পড়িতেছে না। শকুন্তলার কথায়-বার্ত্তায় আকার-প্রকারে শকুন্তলা যে তাঁহাকে ঠকাইতে আসিয়াছে, এ কথাও বলিতে পারিতেছেন না; ঠিক তাহার সব কথা বিশ্বাসও করিতে পারিতেছেন না। কারণ, নিজের সে সকল কথা একেবারেই মনে নাই। সন্দেহ পুরাই হইতেছে অথচ সন্দেহ করিলে চলিতেছে না। এখনি মীমাংসা করিয়া হয় শকুন্তলাকে ও শকুন্তলার ছেলেকে আপনার বলিয়া লও, না হয় উহাকে যাইতে বল। ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। রাজা তখন কি করিবেন? যাইতে বলাই ঠিক মনে করিলেন। করিলেনও তাই। ইহাতে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন না। লইলে বরং দোষ দিত, কলঙ্ক হইত।

যে অবস্থায় রাজা পড়িয়াছিলেন, তাহা যে একটা বিষম সমস্যা, কে অস্বীকার করিবে? ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছ"। ঋষিদের রাজাকে ঠকাইবার কি কারণ আছে? কেন তাঁহারা একটা মিছা হাঙ্গাম লইয়া হিমালয় পর্ব্বত হইতে হস্তিনায় আসিবেন? সুতরাং বিশ্বাস করিবার বেশ কারণ রহিল। আর এক দিকে আবার শকুন্তলার আকার-প্রকার কথাবার্ত্তায় এমন কিছুই ছিল না—যাহাতে বোধ হয়, সে দুষ্ট, শঠ বা কপট বা ঠকাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিজের কথা তাঁহার একেবারে মনে নাই। যদি

কাহারও মনে থাকিবার কথা হয়, তবে শকুন্তলার ও তাঁহার নিজের। রাজা মনে মনে বলিলেন, ইহারা মনে করাইয়া দিক্, আমি লইতেছি। শকুন্তলা আঙটী খুঁজিলেন, নাই। একটা উপায় ছিল, সেটা নাই। কত কথা মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিছুই হইল না। সে কথা মনে পড়িল না। কেমন করিয়া পড়িবে? শাপ হইয়াছে যে, পাগল যেমন আগের কথা পরে মনে করিতে পারে না, তেমনি বুঝাইয়া দিলেও, মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা রাজার মনে পড়িবে না। সুতরাং পাহাড়ে মাথা কুটিলেও যেমন পাহাড়ের কিছুই হয় না, ব্রহ্মশাপের বিরুদ্ধে শকুন্তলার এত চেষ্টা, এত বলাকহা, সব বৃথা হইয়া গেল। ব্রহ্মশাপও নড়িল না, রাজারও মনে পড়িল না। রাজা কি করিবেন? শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন।

আঙটী হাতে পড়িবামাত্র শাপের অবসান হইল, সব কথা রাজার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মনে বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অগ্নিশরণে শকুন্তলার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ব্যবহার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ও তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। তিনি, যে আঙটী আনিয়াছে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, বসন্তের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। অগ্নিশরণে শকুন্তলার তরফ যত কথা বলা হইয়াছিল, সব সত্য বলিয়া ধারণা হইল। যে মাছ ধরিয়া আনিয়াছে, সে ইন্দ্রঘাটের জেলে। আর গোতমী বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রঘাটে শচীকুণ্ডের জলস্পর্শের সময় আঙটী পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ীর কথা ত ঠিকই হইল। আর তিনি কি করিয়া সেই সত্যবাদী বুড়ীকে বৃদ্ধ তাপসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই তাহাকে সামান্য স্ত্রীলোক বিবেচনা করিয়া গালি পাড়িয়াছেন। শকুন্তলা হরিণের কথা মনে করাইয়াছিলেন, তাঁহার মনে পড়ে নাই। তিনি শকুন্তলাকে কাকের বাসায় কোকিলের মত ডিম ফুটাইতে আসিয়াছ বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি এখন বিদূষককে নির্জ্জনে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। এ কথা বলায় রাজার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু রাজা যে তপোবনে শকুন্তলা নামে এক তপস্বীর মেয়েতে আসক্ত হইয়াছিলেন, সে কথা ত বিদূষকও জানিত, সে কেন বলে নাই? তাহার কারণ, রাজা একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তপস্বীর মেয়ের কথাটা পরিহাস মাত্র, সত্য কথা নয়। মিথ্যা কথার ফল ফলিবেই ফলিবে। নহিলে বিদূষক যদি রাজা আসিতেই জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমিও এলে, তোমার সে শকুন্তলার কি ক'রে এলে? তাহা হইলে 'ত' এত বিভ্রাট না হইলেও না হইতে পারিত।

রাজা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। শকুন্তলা অতিথি-সেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। নইলে শুদ্ধ শকুন্তলার দোষে রাজার শাস্তি কেন হইবে?

প্রমোদবনে রাজার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা হইয়াছে, লোক তাঁহার দুঃখে দুঃখীই হইয়াছে। তাঁহার কষ্টে, অনুতাপে, করুণ রোদনে লোকের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যখন শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রয়ে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, তখন সে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। শকুন্তলার তাঁহাকে চিনিতে যতটুকু দেরি হইয়াছিল, তাঁহার ততটুকুও হয় নাই। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র না? নহিলে রক্ষা-মঙ্গল-শুদ্ধ আমার ছেলেকে কে আর অপবিত্র করিতে পারিবে!" ইহাতে চিনিতে যে একটু দেরী হইয়াছিল, বেশ বুঝা যায়। রাজার কিন্তু কিছুই হয় নাই। দেখিবামাত্র বলিলেন, এই সেই শকুন্তলা। যদিও তখন কঠোর নিয়ম করিয়া শকুন্তলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; একটি চুলের বিননী পিছন দিকে ঝুলিতেছে; আর একখানি আধময়লা বাকল পরিয়া আছেন; তথাপি রাজা দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমায় দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলে, তাহাতে বুঝিলাম, তোমার প্রতি আমি পূর্ব্বে যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভালই হইয়াছে।" শকুন্তলার তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি মনে মনে বলিলেন, 'এখন আমার আশার সঞ্চার হইল। রাজার বোধ হয় রাগ গিয়াছে। দৈব বোধ হয় আমার অনুকূল। ইনি সেই আর্য্যপুত্রই বটেন।' রাজা বলিলেন, "রাহু গ্রাস করিলে চাঁদের কিছুই থাকে না, রাহুর হাত হইতে মুক্ত হইলে চন্দ্র যেমন রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হন, তেমনি কোন রাহু আমার স্মৃতিশক্তিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন সে রাহুও মরিয়া গিয়াছে, আর তুমিও আমার সম্মুখে উপস্থিত।" এখন শকুন্তলার ভয় পূরা ভাঙ্গিল। 'আর্য্য-পুত্রের জয়' বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন, "জয় বলিতে গিয়া তোমার যদিও কথা বাহির হইল না, আমার কিন্তু খুব জয় হইল। কারণ, আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম।" বলিতে বলিতে রাজা শকুন্তলার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে জন্য আমার উপর আর রাগ করিও না। আমার তখন কি যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে আপনার মঙ্গল আপনি বুঝিতে পারে না। যে কাণা, তাহার মাথায় ফুলের মালা দিলেও, সে সাপ মনে করিয়া, মালা দূরে ফেলিয়া দেয়।"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য শেষে সুফল দিলেও তখন বোধ হয় দুরদৃষ্ট দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নহিলে আপনি আমার প্রতি এত সদয়, তবুও তখন এত বিরূপ হইলেন কেন?" এতক্ষণ রাজা পায়ে পড়িয়া ছিলেন, এখন উঠিলেন। শকুন্তলা—"আমার কথা আপনার মনে পড়িল কিরূপে?" রাজা—"আমার দুঃখ একেবারে

মুছিলে সে কথা বলিব। তুমি যখন কাঁদিয়া আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, যখন তোমার চক্ষের জল তোমার অধরের উপর পড়িয়া অধরকে ক্লেশ দিতে লাগিল, তখন আমি তাহার দিকে চাই নাই, উপেক্ষাই করিয়াছিলাম, আজ আবার তোমার চোখের পালকে জল দেখিতেছি। আমি উহা মুছিয়া দিয়া নিজের দুঃখ দূর করি" বলিয়া উঁহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তখন রাজার হাতে সেই আঙটী দেখিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, এই সেই আঙটী।" রাজা বলিলেন, "এই আঙটী পেয়েই আমার সব কথা মনে পড়িল।" সে সময় দুর্লভ হইয়া এই আঙটীটাই অনর্থ বাধাইয়াছিল। "তবে এ আঙটী তোমার আঙুলেই থাকুক।" "না, আমি উহাকে একেবারেই বিশ্বাস করি না" বলিতে বলিতে মাতলি আসিল ও সকলকে কশ্যপের নিকট লইয়া গেল। কশ্যপের নিকট রাজা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শকুন্তলাকে সম্মুখে পাইয়াও মনে হয় নাই, পরে আঙটী দেখিয়া মনে হইল, এ কি রকম? দুর্ব্বাসার শাপের কথা রাজাও জানিতেন না, শকুন্তলাও জানিতেন না। মুনি সে কথা বলিয়া দিলে দুজনে সব খবর বুঝিতে পারিলেন। আগাগোড়া সব ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল, আবার দুজনের যেমন ছিল, তেমনি হইল।

এ ব্যাপারে রাজার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে ছাড়া কমে না। রাজার যখন ধারণা ছিল, বিবাহ করি নাই, মনে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বীরের ন্যায় সেই ধারণামত কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে হইল, বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আবার বীরের মত কার্য্য করিলেন। পায়ে পড়িয়া শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন, বিবাহ স্বীকার করিলেন। ছেলে ও স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলাও দুর্ব্বাসার শাপে যথেষ্ট বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম, এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই তিনটি সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম দুটি সখী ছিলেন, তার পর দুটি ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে ষ্টেজে আনিতেই পারেন নাই। শকুন্তলা পাপ কাহাকে বলে, জানেন না। আদরের মেয়ে আদরেই আছেন, সংসারের কঠোরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড় নিদারুণ, সংসারে যে পান থেকে চুণ খসিবার যো নাই, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন। একটি আঙটী—তাও আবার যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। সেই আঙটী না দেখাইতে পারিলে, যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বস্ব দিবেন বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন—তিনিও যে এই সামান্য জিনিসটা না থাকায় চিনিতে পারিবেন না, গরীব শকুন্তলার এতটা

জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সে আঙটীটাকে যত্ন করিয়া রাখিল না। বড়ই কষ্ট পাইল। শেষ রাজা যখন আবার সেই আঙটী তাহার আঙুলে পরাইতে গেলেন, সে বলিল, "আর না, ও আঙটীটাকে আমি বিশ্বাসই করি না।" দোষটা আঙটীর হইল। দুঃখের দায়ে পড়িয়া শকুন্তলা এখন একটু শক্ত হইয়াছেন, এখন আর সে আদরের মেয়ে নাই। সে একাই রাজার সঙ্গে দেখা করিল। রাজা ক্ষমা চাহিলে যথোচিত উত্তর দিল। কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে, তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনও হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন। রাজা চোখের জল মুছাইতে আসিলে, কত কি বলিয়া বাধা দিলেন না, আর সে আঙটীটাকে বিশ্বাস করিলেন না। এইরূপে শাপে দুজনেরই চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে, যে কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সে কালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্ব্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সেকালের কর্ত্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ্ হইলে সেটা ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত। বল্লালসেন মরিলেন, ব্রহ্মশাপে—কত রাজা উৎসন্ন গেলেন, ব্রহ্মশাপে—এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, ব্রহ্মশাপে—এত বড় বামনী মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল, ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়, কাব্যে পড়, আখ্যায়িকায় পড়, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত, ব্রহ্মশাপে—কালিদাস সে কালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে; তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কমলের দুঃখ

(ইন্দু—কমল)

স্নেহাস্পদেষু—

ভাই কমল, তুমি মায়াকে যে চিঠি লিখেছিলে, তার ফলে যে শুধু বাতাসের উপর ভর ক'রে ছিল, তাকে এত বড় আঘাত পেতে হয়েছে। আমি ত জানি না—জবা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি, তোমার ওই চিঠিখানা হাতে ক'রে মুখ থুবড়ে মাটীতে প'ড়ে রয়েছে। মাথার পাশে কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। তার জীবনের সমস্ত সুখ হরণ ক'রে—আজ আবার তার উপর এ রুদ্রদণ্ড করবার তোমার অধিকার? আমি তোমার দিদি, আমি আজ তোমার বিচার করব! আমি এর উত্তর চাই।

তোমার বোঝবার ভুল, নারী বিন্দুতেই সাগররূপে মিশে—সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চায় না। এক ফোঁটা স্বাতি নক্ষত্রের জলে চাতকী তৃপ্তি লাভ করে; সে জানে, তার পদতলে সমুদ্র প'ড়ে আছে,—সে ওই এক ফোঁটা জলেই সমুদ্রের আস্বাদ পায়। ভাই, সাগর থেকে ফোঁটাটি বিচ্ছিন্ন নয়, ওই ফোঁটা ফোঁটা জলেই সাগরের রচনা। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক আমার সাজে না, তুমি বিদ্বান্; কিন্তু বিদ্বান্ই হও আর যাই হও—মানুষ—মানুষ। মানুষ আকাশ নয়, জল নয়, মাটী নয়, ফুল নয়; যতই তার সঙ্গে তুলনা কর, মিশাতে পারবে না। যদি মিশাতে পারতে, তা হ'লে এ জগৎ জগতে থাকত না। তারা আপনিই মিশে থাকত। যাক্—আমি তোমার বিচার করব, আমার রুদ্র দণ্ডও তোমায় গ্রহণ করতে হবে; নইলে জানব, তুমি মানুষ নয়,—যে সংসারের কথা কইছ সে তোমার কাছে ছেলে-খেলা; কিন্তু জেন, সংসার শুধু ছেলে-খেলা নয়।

তুমি কি বলতে চাও যে, যে তোমার জন্যে নারীধর্ম্মে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করেছে সে তোমার চেয়ে কম ত্যাগ করেছে। তুমি বলতে চাও, এই হৃন্মর্ম্মদাহন তার হয় নি। যদি না হয়ে থাকে, তবে এসে একবার দেখে যেয়ো; যে সোনার লতিকা কি ক'রে ভূয়ে ধরা-শয্যায় দিন কাটায়; দেখে যেয়ো যে, সমস্ত পৃথিবীর তাচ্ছিল্য কলঙ্কের আঘাত সে কেমন ক'রে সয়ে রয়েছে। যার নেই, সে আবার ত্যাগ করবে কি? যার আছে, তারই বা ত্যাগে বাহাদুরী কি? মুখে বলছ অধিকার নেই। কিন্তু কাজে তার প্রকাশ অন্য রকমে কেন? ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও, আর যেন সে এমন দেহে মনে

আঘাত না পায়। আমায় জানিয়ো, কোন্ শাস্তি নিতে তুমি প্রস্তুত; কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পার্‌বে? তুমিও যে অন্যায় করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ কি?

তোমার সঙ্গে দেখার পর উনি এসেছিলেন; বিদেশে যাবার কথা তুল্‌লাম, ভাল ক'রে উত্তর দিলেন না—চ'লে গেলেন। জানি না, আমি কি কর্‌ব, বুঝ্‌তেও পারি নে। সব যে কি হয়ে যাচ্ছে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—কি একেবারে ভেসেই যাবে, তা কিছুই বুঝতে পারি নি।

যাক, মনে ক'র না যে তোমার মন আমি বুঝিনি, কিন্তু যদি সকলের সুখই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, তবে তুমি কেন সে দুঃখ নিজে তুলে নাও না। তুমি বিয়ে কর—সেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত; এই আমার বিচার, এই আমার অমোঘ দণ্ড। আমি তোমার দিদি, তোমার উপর তোমার অন্যায়ের জন্যে এই শাস্তি বিধান কর্‌লাম। যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তবে আজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হও। এই আমার আদেশ—এই আমার স্নেহের আশীষ; আর বেশী তোমায় কি আর বল্‌ব বল।

(শৈল—ইন্দু)

চিরায়ুষ্মতীষু—

চিরায়ুষ্মতী ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—অথচ দেখ্‌ছি, জগতে কেউ চিরদিন থাকে না; তাই যখন আমার ইচ্ছা ব'লে কোন জিনিস নেই, তখন আর আমার আশীর্ব্বাদ করা কেন; ভুল অভ্যাসের দোষ, মেয়েলি খেয়াল। তবু আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে অক্ষয় সিন্দুর মাথায় প'রে, অন্তে যেন হৈমবতীর কোলে স্থান পাও!

সংসারের কোন কথায় আর—আর আমি নেই—তবু সংসার ত আমায় ছাড়ে না। তোর চিঠি যা কমলকে লিখেছিলি সেই চিঠিখানা প'ড়ে আছে, তার টেবিলের উপর খোলা। আর সে আজ দুদিন হয়ে গেল কোথায় যে গেছে, কেউ জানে না। দাওয়ানজী এত উদ্‌ব্যস্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন খবর কোন খোঁজই তার পায় নি। কি জানি, শেষ কি সংসার একেবারে ত্যাগ কর্‌লে—হবে! পাথর করেছে সু-বউ! পাথর করেছে—পাথরে আর হাসে না, আর কাঁদে না—পাথরের মতই অসাড় অচেতন হয়ে রয়েছে। কি হ'ল, কোথায় গেল! আর ভাব্‌তে পারি নি। নগেনকে জিজ্ঞাসা কল্লাম,—বল্লাম, "কি হবে, তার কোন খোঁজ পেলে?"—নগেন যেন কেমন চম্‌কে উঠ্‌ল, ফেল্‌ফামুখো হয়ে যেন শাকপানা হয়ে গেল—আহা আহা! হাজার হোক্— সে দরদের টান কোথায় যাবে। বল্‌লে, 'তা আমি ত জানিনে'—ব'লে যেন কেমন হয়ে গেল—দাঁড়াল না, তখনই পালিয়ে গেল। দুঃখ, কষ্ট, লজ্জা, শোক—সবই তাকে ঘির্‌ছে, সেই বা আর কি কর্‌বে? কিন্তু আমি খাবার নিয়ে ডাক্‌লাম, বল্‌লে 'এসে খাব, আমি সুধীরকে একবার আবার দেখি গে', সেই সময় দেখ্‌লাম তোর ভাই

চিঠিখানা টেবিলের পর রেখে বেরিয়ে গেল; আমি ব'সে আছি—এই আসে, এই আসে, তার পর মনটা কেমন হ'ল বল্‌তে পারিনে। অন্য দিন গাড়ীতে বেরোয়, আজ হেঁটে বেরিয়েছিল। কি যে হ'ল, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। যদি অন্যই কিছু হয়, তা হ'লে সে আমি বুঝ্‌তে পার্‌তাম, সুধীরকে খুঁজ্‌তে যাচ্ছি ব'লে যাবে কেন? সে ত জীবনে কখন ভুলে মিথ্যা বলে নি। কি কর্‌ব, তা জানি নি, নগাও ক'দিন যেন কি রকম হয়ে গেছে, যেন পাগলের মত চায়, পাগলের মত চল্‌তে চল্‌তে—থমকে চম্‌কে ওঠে; আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

ভেবেছিলুম, আর তোদের কথায় থাক্‌ব না, আর সংসারকে সার কর্‌ব না, এ যে দেখছি মায়ার জালা—সব ছেড়ে দিয়ে সব এক এক ক'রে চলে যায়; আমি কেন তাদের টেনে টেনে মরি। কি জানি কি হ'ল। হবে বা, ওই পোড়ারমুখী বুঝি কি লিখেছে, চিঠি ত দেখ্‌তে পেলেম না—খামখানা প'ড়ে রয়েছে। শেষ কমল যে আমায় একেবারে এমন ক'রে ফেলে দিয়ে যাবে, এ আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রাণের ভেতর যে কি কর্‌ছে, তা কি ক'রে জানাব। তবু নিজের ছেলে নয়—দেওর, মা-মরা ছেলে মানুষ করেছিলাম। তার এত জালা রে! তোর চিঠিও ত আমার ভাল লাগ্‌ল না—কি জানি, যদি সত্যিই সে অন্য রকম মনে ক'রে থাকে, যদি সত্যই সে প্রায়শ্চিত্ত করবার মতি অন্য রকমে লয়ে যায়। হয়ত ভাব্‌বে, হয়ত ভেবেছে, সে থাক্‌তে পোড়ারমুখীর জালা, তাই নিজেকে অমন ক'রে শুধু সরিয়ে রাখ্‌ছিল না, একেবারে জনমের মত সবার সম্পর্ক ত্যাগ কর্‌লে, সবাইকে জানিয়ে গেল বুঝি তাই। সুখ সাধ, আরাম বিরাম, সখ সবই—সমস্ত ঐশ্বর্য্য থেকেও সে ত্যাগ করেছিল। বুঝি এবার জন্মের মত জীবনটাকেও কোথায় টেনে ফেলে দিলে। কি হ'ল, তা জানিনে। নগার মুখের দিকে চাই আর যেন বুক শুকিয়ে ওঠে। সারা দিন-রাত যে আজ পূজো ভুলে যাই, কেবল পাথরের কাছে কাঁদি, কই পাথর ত আর সাড়াও দেয় না। সে হাসেও না, কাঁদেও না—কেন যে বেঁচে আছি, তা জানিনে। আহা! আমার হাতে তারা সঁপে দিয়ে গিছল, আমি তার খুব পার্‌লুম। একটা এই হ'ল—আর একটা কোথায় গেল, আমারও কপাল; যার কপাল ভাঙে তার পাথরের দেবতাও বুঝি ভেঙে যায়।

(ইন্দু—শৈল)

সে কি, কি হ'ল ভাই, আমি মর্‌তে কেন অমন চিঠি লিখলুম। কে জানে, আমার কি মতি-গতি হ'ল। মায়ার ওই অবস্থা দেখে বড় রাগ হ'ল, দুঃখও হল, তাই তাকে অমন জোর ক'রে বলেছিলাম, আমি তোমার বিচার কর্‌ব। তাই কি এমন হ'ল, কেন আমার এমন মরণ-কুবুদ্ধি হ'ল ভাই,—আমিই তার এই কারণ হলুম। হায়! কি

করি। উনি ত কোথায় থাকেন, কখন্ যে কি করেন, তা ধারণাই নেই। অমর এসেছিল, বল্লে,—'খোঁজ ত অনেক করেছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।' আমি মেয়েমানুষ, সব বুঝে সকল দিক্ ভেবে বল্‌তে হয় ত পারিনি, তা সে কেন আমার কথা ধরালে, সে কেন সব উড়িয়ে দিলে না। কি করব, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সত্যি কি সে সবাইকে ফেলে পালিয়ে গেল?

পরশু রাত্তিরে আবার এখানেও এক কাণ্ড হয়েছে, আমি ত হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। রাত তখন বারোটা হ'য়ে গেছে চোখে যেন ঘুম আর আসে না। জবা আমার কাছে ব'সে রামায়ণ পড়্‌ছিল। বনবাসে সীতা—চারিদিকে গভীর বন, অন্ধকার, নিস্তব্ধ অন্ধকার—হঠাৎ সীতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌ল, সমস্ত বনও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ফেল্‌লে, প্রকৃতি কেঁদে উঠ্‌ল, মাটী যেন টলে টলে উঠ্‌ল, মনে হ'ল—সীতার মনে হ'ল—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সব কি তোলপাড় ক'রে দিলে। লক্ষ্মণকে বল্লেন;—ব'ল তাঁরে—যদিও তিনি আমাকে লোকলজ্জা লোকনিন্দা ভয়ে প্রজার মুখের পানে চেয়ে ত্যাগ কর্‌লেন, তবুও—

তিনি সখা, তিনি গুরু দেবতা আমার।
অনন্যগতি এ প্রাণ তাঁরি পদ সার॥
প্রাণ দিলে যদি হয় সুমঙ্গল তাঁর।
তা হ'তে অধিক ধর্ম্ম কি আছে আমার॥

মায়া ব'সে থেকে থেকে বল্লে, 'দিদি, আমার ঘুম পাচ্ছে, শুই গে', শুনে তার মনটা যে কি হয়ে এসেছে, তা আমি বুঝ্‌তে কতকটা পেরেছিলুম। জবা বল্লে, 'তা তুমি শোও গে, আমি এইটে শেষ করি। তুমি মায়াদি দুঃখের কথা শুনলেই কেঁদে পালাতে চাও—আমার বাপু কিন্তু বড় ভাল লাগে।' মায়া উঠে এসে আমার কাছে শুয়ে পড়্‌ল, জবা তখন পড়্‌তে লাগ্‌ল—

কহিয়ো কহিয়ো তাঁরে দেবরসত্তম।
ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ রঘুকুলোত্তম॥
মাথা পাতি লইনু সে দেবের আদেশ।
বুক পাতি সহিব এ বনবাস-ক্লেশ॥

হঠাৎ পড়্‌তে পড়্‌তে 'উঃ মা গো' বলে মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌ল। আমি ত শশব্যস্ত হয়ে উঠে কি হ'ল কি হ'ল ব'লে কাছে গিয়ে তুলে ধ'রে দেখি, একেবারে সাড়া নেই, মুখখানা একেবারে সাদাপানা হ'য়ে গেছে, কখনত এমন দেখি নি। তার পর জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে বাতাস ক'রে কতক্ষণ পরে জ্ঞান হ'ল। মায়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে; জবাকে কোলে ক'রে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন জ্ঞান হয়েছে—

বল্‌লে, 'দিদি, পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ মনটা কি হ'ল—চোখের পাতা বুজে এল, মনে হ'ল, রাত হয়েছে, ঘুম পেয়েছে, তার পর কি হ'ল, যেন আমি অন্ধকার পথে গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছি—আর কে যেন আমার পিঠে ছোয়া মাল্লে না কি কল্লে—আমার ভয়ানক লাগলো। পিঠে হাত দিয়ে দেখি—এক জায়গায় যেন একটু লাল হয়ে উঠেছে। হাত দিতেই বল্‌লে, 'উঃ! ঠিক ওইখানটায় যেন কি হ'ল।' ভাবলুম, কার বাছা আমার কাছে তার সমস্ত ভার ফেলে দিয়ে নির্ভয়ে নির্ভর করে রয়েছে, আমি না দেখ্‌লে কে তাকে—কে তাকে বুকে ক'রে রাখ্‌বে। আমি নিজে যে কমলের কাছ থেকে তাকে চেয়ে নিয়েছি। জবাও আজ ক দিন যেন তার পর থেকে কি হয়ে রয়েছে। ডাক্তার এসেছিল, কি ওষুধ দিয়ে গেছে, আজ একটু ভাল আছে।

কিন্তু এ খবর শুনে অবধি আমার যেন কি হয়ে গেছে। আমি দেখছি, এ সবই আমার দোষ, আমারই ভুল, না হ'লে হয় ত এত গোলমাল—এত অনর্থ হ'ত না।' সবই দেখছি ওই মায়ার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম, সুখে থাক্‌বে, দেখছি, এখন দুঃখের সমুদ্র। সেও যা হবার তা ত হয়ে গেছে—কিন্তু এ আবার আমি কি কর্‌লাম? কেন তাকে বিচারের 'প্রায়শ্চিত্ত' কর্‌তে বল্লাম? তাই বুঝি সে চ'লে গেল। এমনি আমাদের কপাল। যার উপর নির্ভর কর্‌তে যাই, সেই আমাদের ফেলে দিয়ে চ'লে যায়। কি হবে ভাই, যদি সে না ফেরে! তবে কি হবে—আমি তার এই পরিণাম এনে দিলাম? আমার ত মাথায় কিছুই আস্‌ছে না, কি হবে ঠাকুরঝি, কি হ'ল!

(হেনা—যুঁই)

ওই পুকুরের কাল জলে পদ্ম ফুটে টল্‌-টল্‌ কর্‌ছে—আমার মনেও অমনি পদ্ম ফুটে টল্‌ টল্‌ কর্‌ছে। কিন্তু আবার হিম পড়্‌বে, পদ্ম ম'রে যাবে আবার ঘাসের পাতার লাল আভা হবে—শুকিয়ে পুকুরের পাড়ের পোড়া মাটী দেখা দেবে, আবার গাছের পাতা হ'লদে হবে, ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে ঝ'রে যাবে। শুধু ওই অনন্ত আকাশের তলায়—ফল-পুষ্প-পত্র-হীন তরুর মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। শুধু দেখব, দিক্‌ দিক্‌ দিক্‌ দিক্‌—মহাশূন্য—আর বসন্ত আস্‌বে না—আর তরু নূতন মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হবে না—শুধু স্তব্ধ হয়ে গাছের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। যুঁই! আর কথা কইতে সাধ নেই—আর কাউকে কিছুই বল্‌তে সাধ নেই, আজ নিজের প্রাণের মধ্যেও যে অপরূপ কমলের বিকাশ হয়েছে, তাকেও কিছু বল্‌বার নেই। আমার জীবনের সুখ-বসন্ত ফুরিয়ে গেছে, আর সে সরসতা নেই, তাকে আর কি উপহার দেব। আপনার লোককে আঁখি-জল দেওয়া যায় না, হাসি দেওয়া যায়; আমার হাসিও ফুরিয়ে গেছে, আছে চোখের জল, তা আর তাকে কি ক'রে দেব, তাই ভাব্‌ছি। আজ ত সে আমার ঘরে,—আমারই ঘরে, আজও ত তারে ফুলের ঝারায় ফুলের পালঙ্কিতে ঘুম পাড়িয়েছি; কিন্তু কই, হাসি

আর নেই—হাসি নিভে গেছে। আজ তাকে পেয়েছি,—পেয়েছি কি ?—বুকে বুকে মুখে মুখে পেয়েছি কি—না, শুধু পেয়েছি। বুক ভরে, মনে মনে শুধু নয়। আমার ঘরে ঘরে আজ সব পাখীরা গাইছে, ফুল ফুটেছে, পদ্ম দুলে দুলে উঠেছে; কিন্তু হাসি নেই—হাসি নেই। শিশির পড়ার মত—চোখের পাতায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমা হচ্ছে—অনেক দুঃখে তাকে চেপে রেখেছি। পাছে তার পায়ে টপ্ ক'রে পড়ে, পাছে তার ঘুম ভাঙে। ভাব্‌ছি যদি ঘুম ভাঙে, তবে ত আর তাকে ধ'রে রাখতে পার্‌ব না। যতক্ষণ ঘুমায়, ততক্ষণ দেখি,—নয়ন-মন ভ'রে দেখি,—দেখি,—দেখি, আমার সেই নূতন, নূতন, প্রেমাস্পদ, প্রেমের স্বরূপ, মনের মতন, হৃদয়ের ফুটন্ত পদ্ম—সেই কমল, সেই রূপ!

সে দিন গিয়েছিলাম, সেই বাগানে। সেই মাণিকযোড় ফুলের জন্যে! যার সাদা ফুল আর টুক্‌টুকে বুক, যার গন্ধে মানুষ পাগল হয়, যার হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে আঘাত হ'লে মানুষ মনের মতন হয়; মনের মানুষ হয়, লুটিয়ে পড়ে পায়। সন্ধ্যে থেকে আলো নিয়ে, প্রদীপ হাতে ক'রে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়ে—সারা বাগানের সেই ভাঙা বাড়ীর বালির স্তূপ, সেই তেকাঁটা মনসার বন, সেই কাঁটানটের জঙ্গল, সেই আলু-ইয়ের ঝোপে পাগলের মত খুঁজ্‌লাম। চারিদিকে বিছুটি-বন, আলুইয়ের কাঁটা গায়ে লেগে গা ছড়ে যাচ্ছে, পায়ের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হিম বরফের মত—লতার মত সড়্ সড়্ ক'রে, কি চ'লে গেল, গা যেন কেঁপে উঠ্‌ল, ভাঙা বাড়ীর পড়ো জানালায় বাজুর ধারে দীপের আলো প'ড়ে যেন ভূতের মত কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব'লে মনে হ'ল। হাতের দীপ কেঁপে উঠ্‌ল; আবো খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, বড় বড় ঘাসের উপর থেকে উচ্‌চিংড়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে, আর কট্ কট্ কীরর্ কীরর্ ক'রে ডাকছে। দেখ্‌লাম, সামনে ওই যে—ওই—ওই—সেই সাদা ফুল টুক্‌টুকে বুক! মন্ত্রমুগ্ধের মত খানিক স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালাম—পেয়েছি, হাত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ছে। ফুল ছিঁড়ে তুল্‌লাম, মাথার উপর একটা কাক অন্ধকারে দুবাব কা কা ক'রে উড়ে গেল। হাত থেকে দীপ কেঁপে প'ড়ে গেল। মনে হ'ল, শুন্‌তে পেলেম,—ভাঙা বাড়ীর ভেতর থেকে যেন হা হা হা হা ক'রে কে হেসে উঠ্‌ল। অন্ধকারে যেন অন্ধকারের ভাষা বুক-ফাটা হাহাকারে ভেঙে পড়্‌ল। দীপ নিভে গেছে—চারিদিকেই অন্ধকার, উপরে চেয়ে দেখি, তারাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে; বনের ভেতর পথ খুঁজে পাই না, কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত পা; কাপড়ের আঁচোল ছিঁড়ে তেকাঁটা গাছে আটকে রইল; ফুল—আমার সেই মনের মানুষ গড়্‌বার ফুল, হাতে করে দৌড়ে আস্‌তে লাগ্‌লাম। পায়ে হোঁচট লাগ্‌তে লাগ্‌ল। একবার প'ড়ে গেলাম, আবার উঠ্‌লাম, উঠে সেই জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। বেরিয়ে একটু এগিয়েই আবার থম্‌কে দাঁড়ালাম; মনে হ'ল যেন চারিদিকে আগুন—আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। কে

যেন মশালের মত আলো জেলে, হাতে ধ'রে চ'লে গেল। বড় ভয় হ'ল—তবু এগিয়ে গেলাম—এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। চারিদিকে ভাঙা দেয়াল প'ড়ে গেছে—ইঁটের রাশ, তার পাশে ভাঙা খিলানটা যেন হাঁ ক'রে খেতে এল, পাশে জঙ্গল; যেমনি একজায়গায় পা দিয়েছি, অমনি সেখানটা ভেঙে হুড়মুড় ক'রে পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে খিলানটাও প'ড়ে গেল; ভয়ানক শব্দ হ'ল। সামনেই দেখি, সেই ভাঙা বাড়ীর ধারে মশাল হাতে ক'রে একজন—দুজন—তিনজন যেন সেই শব্দ শুনে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই তারা 'বাবা রে' ব'লে মশাল ফেলে দৌড়ুল। কাছে গিয়ে দেখি, একজন দীর্ঘকায় মানুষ প'ড়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, চারিদিকে রক্ত ছড়ান। কাছে যেতে প্রাণ যেন উড়ে গেল; কি জানি কেন, আরো কাছে গিয়ে মশালটা হাতে ক'রে তুলে ধ'রে দেখি,—আমার আকাঙ্ক্ষার—কামনার সার,—পাপ-পুণ্যের বিধাতা,—সুখ-দুঃখের মণি,—জীবন-মরণের স্বপ্ন—প্রেমের স্বরূপ এ হৃদয়ের সার রত্ন ধূলায় মৃত। বুকে তখনও ছোরাখানা বসান। আমার চক্ষে তখন সে সমস্ত আকাশের তারা নিভে গেল, চোখ বুজ্‌লাম; মশালটা আমার হাত থেকে কেঁপে প'ড়ে গেল—হাঁটু গেড়ে তার সেই মৃতের রক্তাক্ত দেহের পাশে বস্‌লাম। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস নেই; গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, তখনও উত্তপ্ত তখনও তাপ রয়েছে। একবার উর্দ্ধপানে চেয়ে ডাক্‌লাম—যাঁকে জীবনে কখন ডাকি নি, যাঁকে ডাকতে হয় এ কখন জান্‌তাম না—তাঁকে ডাক্‌লাম। বল্লাম, "ভগবান্, বল দাও, এ নারী হৃদয়ে—না হয় আমার প্রাণ নিয়ে এর জীবন দাও। শুনেছি তুমি দয়াময়! হে অনাথের নাথ—পতিতার বুকে বল দাও।" প্রাণপণ শক্তিতে সেই ছোরাখানা তুল্‌লাম। রক্ত—ঝরণার উৎক্ষিপ্ত ধারার মত রক্ত উথ্‌লে আমার মুখ-চোখ সব ভেসে গেল। বুকের উপর রক্ত এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল। গরম আগুনের মত, আমার সব যেন ঝল্‌সে গেল, তখন দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে তাকে বুকে ক'রে তুল্‌লাম। সে দীর্ঘবাহু মহাপুরুষের দেহভার, আর আমি ক্ষীণা দুর্ব্বলা নারী, বহন করতে পারি কি ক'রে—যদি না মহাশক্তিমান তাঁর অভাগিনী দাসীর বুকে সেই বল না দিতেন। বুকে ক'রে অন্ধকারে তুল্‌লাম। তখন এগিয়ে যেতে মনে হ'তে লাগ্‌ল—মাটী যেন পা দুটো আমার টেনে তার বুকের ভিতর ধরে রাখতে চায়। বাগানে থেকে বেরুতে পার্‌লেই রাস্তা—পথ একটু ছাড়িয়ে গেলেই আমি একটা কিনারা পাব; তাই এগিয়ে আস্‌ব, অমনি দেখি, আবার যেন কিসের আলো—পিছন থেকে যেন কে আমার সেই ভিজে খোলা চুল ধরছে; আরো জোরে পিছনের দিকে না তাকিয়ে জোরে ছুটে যেতে গেলাম, মাথার চুল ছিঁড়ে গেল। একবার ফিরে দেখলাম, মশাল হাতে হারু মাষ্টার আর একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার লোক আমাকে ধর্‌বার জন্যে আবার ছুটে আস্‌ছে। তখন কেন জানি না, মুখ থেকে হঠাৎ যেন তাঁরই নাম উচ্চারণ

হ'ল; ভগবান্! ভগবান্ ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। মাষ্টার মসাল ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল। সেই লোকটা সে কিন্তু ছুটে এল; এসে বল্লে, দোহাই ভগবানের, এখন মরেনি, চল মা চল, আমি নিয়ে যাই; দোহাই ভগবানের! আমি বল্লাম, 'সাবধান, আমায় কাছে এস না, আমি তা হ'লে ছিঁড়ে ফেলব, তোমরা এ দিকে এস না।' আমার তখন হাঁফ ধরচে, আর একটু—আর একটু গেলেই পথে পড়্‌ব, আর পারিনে, আপাদমস্তক ঘেমে আর তার রক্তে সব ভিজে উঠল, আর পারিনে। তখন সেই লোকটা বল্লে, 'মা, আমায় বিশ্বাস কর, দোহাই ভগবানের, আমায় বিশ্বাস কর, আমিই মেরেছি, টাকার লোভে, টাকার লোভে, তখন জান্‌তাম না, তখন দেখিনে যে এত সোন্দর, তখন দেখিনে মসালের আলোয় যখন গর্ত্তে পুতে ফেলতে যাচ্ছি, তখন দেখিনে যে, এর মুখখানা আমারই ছেলের মত, তখন জান্‌তাম না, ভগবান্ আছে, ভগবান্! ভগবান্! মা আমায় বিশ্বাস কর, আমি ওকে এখন বাঁচাতে পারি, ও এখন মরেনি, তুই বয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বি নি, আমায় দে, আমায় দে!' আমি তখনও তাকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লাম না, বল্লাম—না, তুমি আগে যাও, পথ দেখাও আর খানিক গেলেই আমার গাড়ী আছে, তাতে আমি এখনি তুলতে পার্‌ব। লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'ভগবান্! ভগবান্! আছে—চল্।' রাস্তায় এসে পড়্‌লাম, পথে দূরে আমার মোটর ছিল সেই অবস্থায় গাড়ীতে নিয়ে তুল্‌লাম, গাড়ী বিদ্যুতের গতিতে আমার বাড়ীতে নিয়ে এল। সেই লোকটাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম না, সাহস করেই নিয়ে এলাম না, তখন মন আমার কোথায়, সে আর কি বল্‌ব। তবু সে যখন মা মা ব'লে ডাক্‌ছিল, কি যেন প্রাণের ভিতর জেগে উঠ্‌ছিল।

ডাক্তার এল, রাত তখন একটা বেজে গেছে। ক্ষত বেশ ক'রে ধুয়ে বেঁধে দিয়ে গেল; বল্লে, ভয় নেই, এখনও বাঁচ্‌বার আশা আছে। আমি তার পা দুটো জড়িয়ে ধর্‌লাম; বল্লাম, যেমন ক'রে হোক্, আমার একে বাঁচিয়ে দিন, আমি আপনাকে লক্ষ টাকা দেব। ডাক্তার ব'লে গেছে, ভয় নেই, সেরে উঠ্‌বেন। আজ সাতদিন জ্বর—ঘোর বিকারে আমার এই ঘরে!!

এখানে নিয়ে আস্‌বার দুদিন পরে জ্ঞান হয়, তার পর ঘোর বিকারে আচ্ছন্ন। উঃ! কি গায়ের তাপ! আর কি যাতনা! থেকে থেকে কখন যেন একবার মা, কি মায়া, ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি, এমনি একটা কথা, আর কোন শব্দ নেই। এই নিয়ে আমায় দিন কাট্‌ছে, আর রাত কাটছে। এঁর পায়ের তলায় বসেই আমি তোকে এই চিঠি লিখ্‌ছি। সেই লোকটা ছাড়া আর কেউ জানে না, কি ঘটনা, কেন এঁকে মেরেছে, সে এও জানে না। হারু মাষ্টারকে দেখে আমার নানা সন্দেহ হয়েছিল—এখন তা বেশ ভাব করেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি। যে এ সেই নগেনের কাম। সুরই

শুনেছি এর কাছে, এ লোকটা এসে এসে খবর নিয়ে যায়, কেমন আছে। তার কাছে শুনলাম, সে বল্‌লে যে, তোমায় মা বলেছি, তোর কাছে আর মা কিছু লুকোব না; আমি মা একটা মহাপাপী, সে অনেক কথা মা, তোরই মত মুখ আমার একটা মেয়ে ছিল—ঠিক তোর মত মুখ, তোর মত চোখ, তোরই মত অমনি হাসি, তোর মত তার দাড়িতে একটা কাল তিল ছিল। একটা ছেলে ছিল ঠিক নয়, কতকটা ওরই মত মুখের ভাব, অমনি সোন্দর। যখন যাবি, তখন দেখি নি, দেখলে বোধ হয় মাব্‌তে পারতুম না মা! আমার এক খুব সুন্দরী স্ত্রী ছিল, ঘরে আমার বুড় মা ছিল। বেশ সুখে দিন কাট্‌ত, গতর খাটিয়ে খেতাম, পাড়াগাঁয়ে চাষবাস ছিল, খেত-খামার ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, ঘরে গাই ছিল, গায়ে জোর ছিল। চাষ কর্‌তাম, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌তাম। হঠাৎ আমার মা ম'রে গেল, সে দিন লক্ষ্মীপুজো, পুজো আর হ'ল না। যখন পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌ছি, নিজের কুঁড়ের দরজায় এসে দেখি, তখন একটু রাত হয়েছে, ঘরে কেউ আলো জ্বালে নি। স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকলুম, কোন উত্তর পেলুম না; এগিয়ে দেখি, মেয়েটা দাওয়ায় ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে; ছেলেটা প'ড়ে চেঁচাচ্ছে; ঘরটা যেন খাঁ খাঁ ক'রে উঠ্‌ল। আবার আমার স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাক্‌লুম, উত্তর পেলুম না, গাছপালা সবই যেন আমার মত খাঁ খাঁ কোর্‌ছে। একটু পরে ফিরে চেয়ে দেখি, আমার ঘরের বেড়ায় আগুন লেগেছে। পড়্‌শীরা বল্‌লে,—তারা সব দূরে দূরে থাকে—বল্‌লে, জমিদারের লোক আমার স্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে গেছে, আর যাবার সময় আগুন লাগিয়ে গেছে। উন্মত্তের মত সেই কাছা গলায় ছুটলাম, সেই জমিদার-বাড়ী, হাতে একখানা কাস্তে; আমি ভাল মানুষের বেটা, গতর খাটিয়ে খাই, আমার মাগের ওপর তার লোভ—এই জমিদার। সেখানে গিয়ে দেখি, বাবুর মজলিসে নাচ চলেছে আর চারিদিকে ইয়ার-মোশায়েবে ভরা। আমাকে পাগলের মত সেইখানে যেতে দেখে অনেকে বাধা দিলে, তবু আমি তার সাম্‌নে গিয়ে কাস্তের বাড়ী মেরেছিলাম; তার পর যে কি হ'ল, তা আমার আর জ্ঞান ছিল না। ওই ঘরের সাম্‌নে আমি তাকে দেবতা ব'লে গড় ক'রে আমার খামারের সেরা ফসল আর খাজনা দিয়ে এসেছিলুম। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন যেন সব ঝিম্‌ঝিম্ করচে, মাথা থেকে পা অবধি ফোড়ার মত ব্যথা; কষ্টে উঠে ব'সে চেয়ে দেখলাম, চারিদিকে লোহার গরাদে আর আমার হাতে লোহার হাতকড়ি। তখন সব বুঝ্‌তে পার্‌লাম; মেয়েটার মুখ আর ছেলেটার মুখ মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পর একদিন বিচার হ'ল, বড় বড় সাহেব দাঁড়াল। আমার ত কেউ নেই, আমার চৌদ্দ বৎসর জেল হয়ে গেল। একবার মেয়েটার নাম ধ'রে রাণী রাণী ব'লে কেঁদে ফেললুম। জেলে প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হ'ত, হাঁ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাক্‌তাম। তারা আমার মাথায় চাঁটী মারত। তার পর সয়ে গেল,

জেলে বেশ—হাঁ বেশ ছিলাম; এখানকার চেয়ে সেখানে অনেক কম পাজী। তার পর জেল থেকে ফিরে যে দিন খালাস পেলাম, সেই গাঁয়ে গেলাম; দেখলাম, সেখানে গাঁই নেই, সেখান দিয়ে কোম্পানী নূতন খাল কেটেছে, কোন চিহ্নই রাখে নি। অন্ত জায়গার লোকের কাছে কাজ চাইলুম, কেউ দিলে না। শেষ এই সহরে এলুম, গায়ে খুব জোর ছিল, এখানে এই গুণ্ডা-খুনেদের দলে মিশ্‌লুম; তারা আমায় খেতে দিলে। সেদিন আমি পাঁচ দিন খাই নি। তখন বুঝ্‌লুম, তারাই আমার দরদী; তারা যা বল্‌ত তাই কর্‌তাম; যাদের নেই, তারাই ভাগ ক'রে খায়; যাদের আছে, তারা কখন দেয় না মা। এমনি ক'রে বছর তিন কেটে যায়। ওই যে বাবুটা আমার সঙ্গে ছিল, ও একদিন আমায় বল্‌লে ডেকে, দশ হাজার টাকা দেব, যদি এ কাজ কর্‌তে পারিস্‌। আমায় আগাম পাঁচ হাজার টাকা দেয়, পরে আর অর্দ্ধেক দেব বলে। টাকার লোভে এ কাজ করেছি। মেরে ধ'রে এমন ঢের কেড়ে নিয়ে ভাগাভাগি করেছি কিন্তু একেবারে খুন করব ব'লে এই প্রথম, আর কখনো করি নি। যখন মা তুই ভগবান্‌ ব'লে ডাক্‌লি, অমনি মনে হ'ল, আমার ভিতরে কে যেন ভগবান্‌ ভগবান্‌ ব'লে ডাক্‌ছে—কে যেন মা বল্‌লে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি, জানিনে মা এর কি প্রাশ্চিত্তি হবে। কেন সব এমন কাজ কর্‌লুম, কার জন্যে কর্‌লুম, পেটের দায়ে খুন কর্‌লুম, টাকার লোভে অন্ধকারে মানুষের পিছনে ছুরি মার্‌লুম, কেন মা এমন কর্‌লুম; কিন্তু তোকে দেখে অবধি মনে হচ্ছে, তুই যেন আমার সেই মেয়ে—সেই—সেই মা সেই রাণী। উন্মাদের মত লোকটা কেঁদে উঠ্‌ল। তার পর চ'লে গেল। আমি তার কান্না শুনে অবধি কেমন হয়ে গেছি—স্বপ্নের মত যেন কি মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। একখানি কুঁড়ে ঘর, কেমন সুন্দর, একখানি মুখ, কেমন খোলা সবুজ মাঠ, কেমন চাঁদের আলোয় মার সেই চুমু—সেই একটি গাই। চোক ফেটে জল এল, আমিও ত কেনা মেয়ে, তবে কি সত্যই এই লোকটা আমার বাপ? এই ভয়ানক চেহারা খুনীটা—কি ঘৃণা—কি ঘৃণা আমার বাপ খুনী! এঁ্যা! আমার বাপ খুনী! মাথাটা যেন কেমন তোলপাড় হয়ে গেল, এঁ্যা। এই আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন অভাগীর সূর্য্যকে উপড়ে অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে—এ আমার বাপ—হবে। না না, তা কেন হবে? যদি এ না বাঁচে—ওঃ! তা হ'লে ও বাপ মান্‌বো না, কাউকে মান্‌ব না, অমনি ক'রে ছোরা তাদের বুকে বসাব। ভাবছি, এমন সময় 'মায়া মায়া' ক'রে উঠলেন, সব ফেলে উঠে গিয়ে দেখি, তখন চোখ তাকিয়েছেন। কি সুন্দর অরুণ আঁখি, যেন কাকে খুঁজ্‌ছে; যেন কি বল্‌বে ব'লে তাকাচ্ছেন। তখনই ঔষধ দিলাম, একবার যেন কি ভেবে উঠ্‌তে গেলেন। তখনই আবার ধর্‌তে না ধর্‌তে প'ড়ে আবার অঘোর হয়ে পড়্‌লেন। কি হবে? আমি ত এঁকে বুকে নিয়ে এলাম; কিন্তু যদি না বাঁচাতে পারি, তবে কি হবে? দিনরাত কাটছে কাটুক, কিন্তু

যদি—উঃ! আর সে কথা ভাবতেও পারছি নি। ব'সে আছি আর দেখছি, ভাবছি, এ পাখী পোষবার মত খাঁচা যে আমার নেই, এ ত উড়ে যাবে, যে দিন এর ঘুম ভাঙ্গবে, সেই দিনই উড়ে যাবে; সারা দিন সারা রাত আমার এমনি ক'রে কাটছে। এখন এত বেশ কেটে যাচ্ছে, এর পর কি ক'রে কাটাব? একবার—একবার সাধ হয়, ওই পদ্মের পাপড়ির মত পা দুখানি বুকে ধরি; ভয় হয়, আমার নেবার অধিকার কি? ভয় হয়, এ অপবিত্র দেহের সুখসাধের স্পর্শ তাঁর পায়ে কি ক'রে স্পর্শ করাব? তা ত পারিনে, কেমন ক'রে এঁকে বাঁচাতে পারব। আমি যে বুকে ক'রে নিয়ে এলাম, যেন সে এর স্পর্শে কাতর না হয়। সে যেন আবার হাসে, আর একবার যাবার সময় তেমনি ক'রে তাকিয়ে যায়, শুধু মুখ তুলে জানি পাব না, তবু একবার যদি মুখ তুলে তাকিয়ে যায়।

(শৈল—ইন্দু)

সু-বউ,

নগেন নাকি তোর বাড়ীতে গিয়ে অনেক হাঙ্গাম আর উৎপাত করেছে, মায়াকে নিয়ে আস্‌বার জন্যে? শুনলুম দরোয়ানদের সব মারধর ক'রে ভেতরে বদমায়েস নিয়ে ঢুকতে গিছল—পারে নি, শেষ ওর এমন মাথা বিগড়ে গেল? আমি যে কি করি, তা জানি নি। আমায় সেদিন বল্‌লে, 'বৌদিদি, তোমরাই আমার সর্ব্বনাশ করেছ, আমার ভাই-ই আমার পরমশত্রু—তার জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা, নইলে আমি ত মানুষ ছিলাম, এখনও ত আছি, তোমরাই আমার সর্ব্বনাশের পথ ক'রে দিয়ে নিজেরা বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছ। আমি তখনই বুঝ্‌লাম, এ কথা বল্‌বার কারণ কি! পাছে কথা বাড়ে, আমি আর তাকে কোন উত্তর দিলাম না। মনটা ভার, মুখখানা লাল ক'রে চ'লে গেল। কিন্তু আমি তার একটা ভয়ানক বদল দেখছি, সে যেন কথা কইতে কইতে কেমন ক'রে ওঠে—চল্‌তে চল্‌তে চমকে ওঠে—শূন্যে হাত মুঠো ক'রে ছোড়ে; আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না; শেষ এও কি পাগল হবে! আমার কেবলই সেই ভয় হ'চ্ছে। হায় রে মানুষের মায়া—এখনও ভয়! কমল ছেলেবেলায় আমায় মা ব'লে ডাক্‌ত, এখনও হঠাৎ এক একদিন তার মুখে সেই মা বেরিয়ে যেত; আমি আনন্দে আহ্লাদে সমস্ত দেহ মন দিয়ে সেই তার মা বলা শুন্‌তাম; সেও আমার ফুরিয়ে গেল। পাথর হয়েও মানুষ পাথর হ'তে পারে না—যতক্ষণ এই প্রাণ থাকে। আগে পাথর কথা কইত, এখন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে আর পাথর এখন নির্ব্বাক্। বলেছিল একদিন হেসে—আর বেশী দেরী নেই; আজ দেখছি, কই দিন ত আর ফুরোয় না, হায় মানুষের মায়ার টান, ছিঁড়েও ছেঁড়া যায় না—এমনি ছল তার।

কমলের কিছুই খবর পেলাম না, কোথায় গেল, কেউ বল্‌তেও পার্‌লে না। আমার মনে হচ্ছে, কোন বিপদ্ ঘটে নি ত। আমার মনে তাই কেবল হচ্ছে।

জবার খবরটা আমায় দিস্। মায়া কেমন আছে—আহা, এ সবই তার আরো বেশী লাগ্‌ছে। কি থেকে কোথায় কি দাঁড়াল, তাই এখন ভাবি। তাই কেবল ভাবছি, আমি যদি গোড়ায়, সব বুঝে, খুলে ব'লে এ কাজ করতুম, তা হ'লে হয় ত এ ঘটনা এমন হয়ে দাঁড়াত না। কে জানে, মানুষের কর্ম্মফল—হাত বুঝি নেই। কার কর্ম্মফল কে ভোগ করে, নিজে—নিজেরই বুঝি। কিন্তু একজনের জন্যে অন্যে দুঃখ পায় কেন? একজনের পাপে অন্যে শাস্তি পায় কেন? কে বল্‌বে কার কর্ম্মফল। পাথর প'ড়ে আছে, তার কাছে কাঁদি; এখন আর সে হাসে না, মুখখানা ঘোর ক'রে ব'সে থাকে। দেখি বেশ, যখন সবাইকে ফেলে দিয়ে পাথরের কাছে আসি, তখন পাথর কত কথা কয়; আর যে দিন আবার সবাইকে বুকে ক'রে জড়িয়ে তুল্‌তে যাই, পাথর আর আমার সঙ্গে কথা কয় না, আর সে ফিরে চায় না। এ জগতের বুঝি এমনি মজা—কেউ পর কর্‌তে চায় না—ঠাকুরও নয়। সবাইকে কেন একসঙ্গে আপনার করতে পারি নি? তাই ত দুঃখ। সবাইকে যদি আপনার করতে পার্‌তাম—তা হ'লে ত বেশ হ'ত। তা কেন হয় না? সবার দুঃখ যদি নিজে নিতে পারি, তবে ত বেশ হয়। একবার এর জন্যে—আবার তাকে ফেলে—অন্যের জন্যে। পাথরের কাছে সবারই জন্যে মাথা খুঁড়ি, তবু সবার ত ভাল হয় না। তাই বুঝতে পারি নে, কার কর্ম্মফল কে ভোগ করে—একের পাপ অন্যে কেন ভোগ করে। একের জ্বলুনি অন্যের কেন হয়?

এদিকে আর এক কাণ্ড—ছোটবৌয়ের গয়নার বাক্স নগেনের কাছে আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। নগেনও সব নিয়ে গিয়ে তার নিজের কাছে রেখেছিল। কি জানি কেন, আশ্চর্য্য, তার একখানিও নষ্ট করে নি, নিজের ছাড়া সে আর কার জিনিষে কখন হাত দেয় নি। তুই শুনেছিস্—জানিস্ ত, ওই একটা মাষ্টার ব'লে ওর ইয়ার আছে—চিম্‌ড়ে মড়ুইপোড়া বামুন একটা—সেই হ'ল এখন দোসর। সে দিন দুটোতে খুব মদ খেয়েছে; ওদিকে মাষ্টার ক'রেছে কি—কখন নাবার সময় সেই গয়নার বাক্সটা নিয়ে স'রে পড়েছে—তখন অল্প রাত; দাওয়ানজী কোথা থেকে ফির্‌ছিল, কমলের খোঁজে গিছল। দেখে, ওই মাষ্টারটা বাক্সটা নিয়ে; তাকে দেখেই একটু পাশ কাটাতে যায়, বুড়া তাকে ধ'রে ফেলে। সে তখন নানা ওজর ক'রে বলে, ও বাবু দিয়েছেন, টাকার জন্যে। এর মধ্যে খান কতক গয়না আছে! দাওয়ানজী তখন তাকে ধ'রে বাড়ী নিয়ে আসে। দারোয়ানেরা তাকে আট্‌কে রাখে। নগেনের কাছে দাওয়ানজী এসে দেখে, মাতালের অবস্থায় ব'সে আছে, সাম্‌নে মদের গেলাস আর বোতল। আপনার মনে বল্‌ছে—'হ'ল না, হ'ল না, ঠিক্, কোথায় পালাল, ছোরা বসিয়েও পার্‌লুম না, ও হোঃ, তবু হ'ল না, কোথায় লুকোল —ভয়ে—ভয়ে—না না—পেত্নী, পেত্নীতে তাকে নিয়ে গেছে—জাহান্নামে—জাহান্নামে —প্রেম প্রেম—জাহান্নামে, দাঁড়াও, তাকেও পাঠাচ্ছি—সব শেষ কর্‌ব, সব শেষ কর্‌ব,

ব'লেই টল্‌তে টল্‌তে উঠেছে। দাওয়ানজী বল্‌ছিল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ওই সব শুনে মনে করলুম, এই নগাই কি করেছে, যাতে কমলের বিপদ্ হয়েছে—নিশ্চয়। তখন এগিয়ে তার কাছে যায়, গিয়ে বলে, 'নগা, কমল কোথা?' বল্‌তেই সে কেমন হয়ে যায়—তার পর বলে—'তা আমি কি জানি, কে কোথায় যায়, আমি তার খবর রাখি? আমি কি নরকের দাওয়ান যে, সবার খাতা ঠিক ক'রে রেখেছি।' ওদিকে সেই মাষ্টারকে নিয়ে তখন দরোয়ানেরা আসে, মাষ্টারকে দেখেই যেন নগেনের নেশা কতকটা কেটে যায় ব্যাপারটা শোনে—শুনে তখন বলে—'মাষ্টার, আমি তোমায় বন্ধু মনে করতেম, তাই ত তুমি!' মাষ্টার বলে—'সে কি, এই যে তুমি আমায় টাকা ধারের জন্যে নিয়ে যেতে বল্‌লে।' নগেন বল্‌লে—'ও তা হবে, ভুলে গিছলুম নেশার ঝোঁকে, ছেড়ে দাও।'—দাওয়ানজী তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে বল্‌লে—'বড়মা! আমার খুব মনে নিচ্ছে। যে, এই মাষ্টার আর নগেনে মিলে কি একটা কাণ্ড করেছে। আমি বুঝতে পারছি নি। আমার মনে হচ্ছে, আমি এদের গ্রেরেপ্তার করিয়ে দিই।' দাওয়ানজীর কাছে এই সব শুনে অবধি—আমার হাত পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। আমি আর ভাব্‌তে পারছি নি। তাকে বল্লুম, না, গেরেপ্তার করিয়ে কি হবে, যদি ভাল মন্দ কিছু হয়ে থাকে সে আমারই। আবার কেন ভাল মন্দের জন্য অন্যকে দায়ী করি। দাওয়ানজী বলে 'না, দুর্জ্জনের শাস্তি চাই—নইলে ধর্ম্ম থাকে না।' আমি বলি—তুমি আমি শাস্তি দেবার কে? ধর্ম্মের বিচার ধর্ম্মই করবেন। দাওয়ানজী কেঁদে চলে গেল। শেষ এও হল—এমন হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি! তাই ভাবছি কার কর্ম্মফল কে ভোগ করছে, কার পাপে কার সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে। কমলেরই কি দোষ সব—হবে! আমিত বিচারকর্ত্তা নই। নিজের কর্ম্মফলে এদের সংসারে এসেছি, এদের সঙ্গে সঙ্গে সব ভোগ করছি। নইলে আমার আর সংসার কিসের। আমার কেন এত টান; কেন কেবল মনে পড়ে ছোট বেলা থেকে যে এদের মানুষ করে তুলেছি—সে যে আমায় মা বলত। দুঃখ করেই বা কি করব, তাও জানিনে, সে যদি গিয়ে থাকে, সেত গেছে—যারা আছে তাদের কেন সুমতি হোক্ না। তারা কেন শান্তি পাক্ না। তাদের কেন নূতন ক'রে জ্বালার সৃষ্টি। বুঝতে পারি নি, ভাবি কাঁদি, কাঁদলেও ত ফল হবে না। ভোগ করতেই হবে।

হায়! কে উত্তর দেবে, কার পাপে আমার মিহির গেল? কে উত্তর দেবে—কার পাপে সুধীর আজ এমন হ'ল? কে উত্তর দেবে—কেন এ মায়ার টান—কেন পরের জন্যে না কেঁদে থাকতে পারি নি। কেন হাসি দেখলে হাসি, কান্না দেখলে কাঁদি। এর উত্তর দেবে কে? জন্মালাম কোথায়, হলাম কাদের বাড়ীর বউ—যৌবনের

আশা আকাঙ্ক্ষা না পুরতেই সে বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সংসারকে টেনে বুকে তুললাম, সংসার আমার কত আপনার হল। তার ভুল ভেঙে চলে গেল, তবু আমার ভুল ভাঙে না। সংসারে থেকে সংসারের বাইরের কথা বুঝেও বুঝতে দিলে না। চোখে একবার হাসি দেখালে, আবার সেই চোখে জল ভরে দিলে। কে জানে—পাথরের এ কি রকম! সবই সেই করে, যা তাঁর ইচ্ছে তাই হবে।

হেনা—যুঁই।

আমার এই পাঁচিল ঘেরা বাড়ী তার ভিতরে বাগান, আর ওই পুকুর, পদ্মে পদ্মে পুকুরের কাল জল আর দেখা যাচ্ছে না। ভোর না হতে, কমল আঁখি মেল্‌বার আগে আমি—আমি পুকুরে নামি পদ্ম তুল্‌তে, কেমন সব মুখটী তুলে রবির আলোর আশায় আঁখি কচালে ফুট্‌তে চায়; সারা রাত্তির সোণার—সোণারই স্বপন দেখে, শেষে ওই, শেষে ওই সোণার, সত্যি সোণার আলোয় জেগে ওঠে! দেখি কেমন ভোমরাগুলো তার কানের কাছে গুণ গুণ করে বলে বেড়ায়—'ঘুম এখনও ভাঙলো না তোর, এত কি তোর স্বপনের ঘোর। ওই যে রবির আসা উষার পায়ের আলোয় ফুটে উঠেছে, ওই শোন্ সারা ধরা সজাগ হয়েছে, ওই শোন্ ওই হাঁসের শ্রেণী মালা গেঁথে ডেকে ডেকে উড়ে গেল, ওই শোন্ ভোরের বাঁশী ঘুম ভেঙে চমকে উঠেছে। ওই দেখ বেতস কুঞ্জতলে জলের হিল্লোল উঠেছে, এখনও ঘুম ভাঙল না তোর।' গুণ গুণ গুণ গুণ ভোঁ ভোঁ। পদ্ম বলে 'না না—তার মুখ না দেখলে ফুটব না—আমার সে মোহন ছবি প্রেমের রবি না এলে আমি ফুটব না'—বলে ঘাড় নেড়ে দুলে দুলে ওঠে। সত্যি, প্রেমের রবি না পেলে কেন ফুটব। কিন্তু যে ফুটেছে কার জন্যে তা জানে নি, যখন জান্‌লে তখন তার সব গন্ধ বাতাসে উড়ে গেছে। তার কি আর ফিরে ফোটা চলে, ঝরাই তার সার্থক। ঝরে গেছি, ঝরে গেছি, আর উপহার দেবার কিছু নেই। যে অন্ধকারে ফোটে, সে আলোয় ঝরে যায়। আমি ফুটেছিলুম কোন অন্ধকারে, তাই আলো পাবার আগে উষার সোণার নিকষে টানা দেখেই ঝর-ঝর হয়ে এসেছি। যুঁই! ঝরব, ঝরেই যাব,—কোথায়, তার পায়ে। তবু তারই পায়ে যেন ঝরি—তবু যেন তারি পায়ে ঝরি। ফুটবার সময়ও বিচার চলে না—ঝরবার সময়ও বিচার নেই।

ওই বেশ ভোর হয়ে এসেছে, কমল বোধ হয় এখন যেন কেমন অঘোর হয়ে রয়েছে, মাঝে একটু শুধু জ্ঞানের মত হয়, আবার তেমনি অঘোরে। ডাক্তার ত রোজ কত বার আস্‌ছে, বলছে ভয় নেই—আর কটা দিন বইত নয়; কটা দিন কাটলেই বিকারের ওয়াদা কেটে যাবে, তখন সেরে উঠবেন। কত ত অনেক সুস্থ দেখি, কি জানি, যতদিন যতক্ষণ না উঠবেন ততক্ষণ আর আমার ভরসা নেই। দাঁড়িয়ে আছি; কত কি ভাবছি। পদ্মগুলো সব তারি পায়ের কাছে ফুট্‌তে চাইছে, তার স্পর্শেই ফুটবে,

তার মুখ চেয়েই ত আমি ফুটেছি—ঝর্‌ব ব'লে; কে জানে কি ভাবি, কি বলি; তোকে সকল কথা বলতে পারি, তাই বলতে চাই, ব'লে বুঝি আরাম পাই। কি জানি কেন বলি,—কেবল মনে হচ্ছে, এখন এঁকে সারিয়ে তাঁর বাড়ীতে রেখে আসতে পারি। আমি এ কলুষিত জর্জ্জরিত তাপিত দেহে, এ পোড়া কলঙ্কের কালীর ছেপ, কেন তাকে দেব, আমি যে তাকে ভালবাসতে পেরেছি—আর আমি তাকে ভোগ করতে চাই নে। সে যদি চায়, সে যদি দয়া ক'রে তুলে নেয়, যদি তার ভোগের সাধ হয়, সে তুলে নিক্‌; এ উচ্ছিষ্ট দেহে তাকে কেমন ক'রে গ্রহণ করব। সে যে আমার ঠাকুর, সে যে আমার দেবতা, সে যে আমার ইষ্ট, সে যে আমার নিষ্ঠা। অনেক দিন পরে ইষ্টকে জানলাম। যখন প্রথম-যৌবনের ভাবে ফুটতে ফুটতে সলাজ-লোচন মেলে ইষ্টকে অন্তরাত্মা খুঁজেছে, তখন সে পায় নি; তখন সে অর্থরূপে—সুখরূপে দেখা দিয়েছিল, রূপের রূপকে ইষ্টকে তখন সে জানে নি, আজ ইষ্টের মূর্ত্তিতে ওই আমার জন্মজন্মান্তরের স্বপ্ন, জাগরণে মূর্ত্তি ধ'রে এসেছে। আজ ইষ্টের দেখা পেয়েছি, সবই হয়েছে, কেবল প্রাণ এখনও তৃপ্তি পায় নি। ইষ্টকে চোখের সামনে দেখে তাকে এ দেহ দিয়ে বহন ক'রে নিয়ে এসে—প্রাণ তৃপ্তি পায় নি; কেবল মনে হচ্ছে, কেন এ অপবিত্র দেহ দিয়ে তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে এসেছি? সে যে আমার প্রেমের রবি—তাঁকে কেন কলুষ মাখালাম? আবার মনে হয়, তা কেন, সূর্য্য সর্ব্বত্রই আলো দান করে, সূর্য্যের আলো শ্মশানের মড়ার উপরেও পড়ে, নলিনীর বুকের মাঝেও পড়ে, তায় রবির কি? তায় রবিতে ছায়া পড়ে না—যে কেবল আলো, তার আবার ছায়া কিসের? আলোর ছায়া পড়ে না। যাতে আলো পড়ে, সে ধন্য হয়—এ দেহ তাকে স্পর্শ করেছে, তার রক্তে মুখ চোখ বুক ভেসে গেছে, দেহ ধন্য হয়েছে। আহা! প্রেমাস্পদ আমার জন্যে তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত সহ্য করলে, আমার জন্যে এমন জীবন-মরণে যুদ্ধ করলে, আমার জন্যে ঝলকে ঝলকে বুকের রক্ত দিলে; প্রেমাস্পদ আমার এই চাওয়ার পাপের ফল তোমায় ভোগ করালুম ...। যুঁই! পাপ-পুণ্য বুঝি নি, এখন কেবল এক মনে হয়, এত যে তাকে পায়ের তলায় লুটিয়ে নেব মনে করলুম—সে সব তেজ আমার কোথায় গেল? এখন কেবল নিজে সেই পা যেখান দিয়ে গিয়েছে, সেখানে লুটতে, তাকে তীর্থ মনে ক'রে—সেই ধূলা বুকে ধারণ করছি, সেই এখন আমার কত সাধের মণিহার! সে আকাঙ্ক্ষার—সে বাসনার জ্বালায় গাঁথা মণিমালার চেয়ে, আজ ধূলা কত গৌরবের—কত আনন্দের।

ভাবতে ভাবতে সেই লোকটার কথা মনে হ'ল, যে মেরেছে তার কাছে শুনেছিলুম, পিঠে ছোরা মেরেছিল সে, তার পর—পড়ে যাবার পর—বুকে আঘাত করে—নগেন নিজে। উঃ! যে ভাই তার শির কেটে রক্ত ঢেলে দিয়েছিল—তার বুকের রক্ত দেখবে না, তবে বীর কি? যে রক্তে জীবন, সেই রক্তপান কি চমৎকার! যুঁই! মানুষ এত দুরও

পারে! আজ আমার এই খুনে লোকটাকে বাপের আভাসে তাকে স্নেহ করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর আপনার ভায়ের মত তাকে জন্ম থেকে জেনে, তার বুকে কি করে আগুন জ্বলে! আশ্চর্য্য! আমরা কি যুঁই যে, দেবতাকে তার দেবত্বর আসন থেকে টেনে পিশাচে পরিণত করি! নগেনও ত এত খারাপ ছিল না,—এত আমারই জন্যে। সংসারে জন্মালুম কোন ঘরে, সে ত কুয়াশা ঢাকা, মনে পড়েও পড়ে না। বাপ কেমন তা জান্‌লাম না, মা কেমন তা বুঝলুম না। ভাই যে কত আপনার, সে ভাববার অবসরও কেউ দেয় নি। যে পালন করলে, যে একশ' টাকায় কিনে নিয়ে এসে, দশলক্ষ টাকা দেখালে, সে আমার মা নয়. সে রাক্ষুসী। আমায় খেলে, যখন প্রথম কৈশোর আর যৌবনের মাঝে পড়েছি, তখন কেউ এলে কেঁদে ভয়ে পালিয়ে গেছি। মার খেয়েছি, বেতের দাগ এখনও যায় নি। পূর্ব্বজন্মের, জন্মান্তরের কত পাপ, তাই চিরজীবন উপরে আগুন, নীচে আগুন, তার মাঝে থেকে এসেছি—সেই কেনা মা-ই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আজ তাই কাঁদছি, আজ তাই বুঝি এ খুনে, যে আমায় পাপের পথে নিয়ে যায় নি—নিজে অত বড় পাপী, তাকে বাবা ব'লে ডাকতে দ্বিধা হয়েও স্নেহ করতে সাধ হচ্ছে। জানি না, সত্যি আমার এ বাপ কি না। যদি সত্যি হয় হবে, হাঁ। এই খুনীটা আমার বাপ—হবে!···ওই সে লোকটা আবার আসছে। মনে করি দেখা করবো না, আবার কেমন মায়া হয়, দেখে ফেরাতে পারি নি। কেমন মনে হয়—আহা, এ যে আমার বাপ! সে এসে বল্‌ছে, 'মা, তোকে দেখে অবধি প্রাণ যেন কেমন কর্‌ছে, আমার প্রাণ বলেছে, তুই আমার সেই রাণী।' সেই সময় একটা ভিখিরী ফটকের ধারে এসে গান গাইছিল, লোকটা অবাক্ হয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল,—

ও মা রাণী, বল দেখি শুনি,
আমার, পাষাণ-গড়া এ বুক ভেঙ্গে কোথায় ছিলি পাষাণী।
যেন জন্ম জন্ম ধ'রে আছি উমা স্বপ্ন ঘোরে
তুই আসিস্ আসিস্ মনে ক'রে, ওই আকাশে দিন গণি॥"

গান শুন্‌তে শুন্‌তে লোকটা যেন পাগলের মত তাকাতে লাগ্‌ল। তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল,—আমিও যেন কেমন হয়ে গেলুম। ভিখিরী তখন গাইছিল,—আজ আগমনী—তাই ভিখিরীও গান গাইছিল—

ভেবে ভেবে পাথর হয়ে, হেরি আসে কুয়াশা ছেয়ে
বুক ফেটে এ ধারা বয়ে ঝরণা ঝরে দিন-যামিনী।
আয় মা আমার বুকে আয়, মুছে দে মা আঁখি-ধারায়
(ওরে) মেয়েরে কি ভোলা যায়, সে যে বুকের চিন্তামণি॥"

লোকটা যেন কেমন হয়ে গেল; ব'লে উঠ্‌ল 'রাণি! রাণি! তুই মা আমার সেই

সত্যি রাণী!'—বলে, ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে বল্লে, চোখ মুছলে, বল্লে, মাগো না কেঁদে থাকতে পারলুম না। কিছু মনে করিস্ নি মা,—ওই ছেলে আমার ভাল হলে একবার তার কাছে মাপ চাইব, একবার সব কথা ব'লে কেঁদে—না না—কেঁদে নয়, বলব আমায় মাপ কর। তাই আসি—নইলে, একি—একি—একি মা, আমার মেয়ে—আমার মেয়ে এমন এমন, এ কি হয়েছিস্? এর চেয়ে যে তোর মরা ভাল ছিল, এর চেয়ে যে আমার তোর জন্ম জেলে থাকা ভাল ছিল, এর চেয়ে কি বলব তুই ভিখিরি হলি নি কেন? হায়! মাগো, তোকে যদি এমন রূপে না দেখতাম, না চিন্‌তে পার্‌তেম,—ষোল বছর পরে যদি না চিন্‌তে পার্‌তাম,—ব'লে কেঁদে লোকটা চ'লে গেল। হঠাৎ যেমন সাপে কামড়ালে, বাপ রে ব'লে লোকে সভয়ে ছুটে পালায়, তেমনিতর আমার মুখের পানে চেয়ে চ'লে গেল। পাথরের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, দেখলাম, লোকটা তেমনি সজল-চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে চ'লে গেল। আমার মনের ভেতর যেন একটা ঘূর্ণীর হাওয়া গর্জ্জে গেল। ভাবলুম, আমি আজ বেশ্যা ব'লে বাপ আমার এমন দিনে ত্যাগ করলে? ওই খুনে সে আমার বাপ, কেন আমার বাপ খুনে হ'ল। যুঁই! মানুষ নিজে খারাপ হলেও আপনার কাকেও খারাপ দেখতে চায় না। বড় তার লাগে। আমি বেশ্যা, আমিও চাইনে যে, আমার বাপ মিথ্যাবাদী হোক্—এমনি মজা। জগতে মন্দ কেউ যাচে না। যাচাই করতে মন্দ বেরিয়ে পড়ে। ওই! ওই! বুঝি তিনি কাকে ডাকলেন—যাই!...

না, তেমনি অঘোরে আছেন। ডাক্তার বলেছে, কোন রকমে যেন কোন বিষয়ে উত্তেজনা না পান, জ্ঞান আপনা আপনি আস্‌বে। আমি তাই চুপ ক'রে চেয়েই আছি। দিন কাটে, রাত কাটে, তাই চুপ ক'রে শুধু নিশ্বাস ফেলি। মুখখানা যেন কেমন ফিকে হয়ে গেছে; এক একবার মনে করি, ওই পাপড়ির মত ঠোঁট দুখানিতে—সে দিন ঘুম ভাঙবে, সে দিন ত আর দেবেন না। তখনই—আবার মনে হয়, না, সেটুকুর অধিকারও ত আমার নেই; সে দয়া তাঁর। আবার একবার ভাবি, না, যদি এ ঠোঁট মিলে, কে জানে, হয় ত আমার কি বিষ আছে, যদি আর না জাগে, যদি আর না আঁখি মেলে—তবে? তাই চুপ ক'রে নিশ্বাস ফেলি, চুপ ক'রে চেয়ে থাকি। তার পর আর একটা—এ অপরূপ আমার জন্ম নয়, যার জন্যে তাকেই বুঝি স্বপ্ন দেখেন, তাই ডাকেন। তখন আর আমার ভাববার পথও ঘুচে গেছে লো, আর ভাবি কেন? আর চাই বা কেন? এখন শুধু সেরে উঠলেই বাঁচি। আমার, আমার পথ বোধ হয় এক রকম ঠিক হয়ে রয়েছে। তিনি জাগলেই আমার কাজ ফুরুবে। আর বোধ হয় কোন কাজ রইল না, থাক্‌বেও না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

বৈষ্ণব-কবিতা *

(সমালোচনা)

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্য-সমূহের সমালোচনাত্মক "রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যিনি বাংলার সাহিত্যসেবীদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, সেই অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ মহাশয় বর্ত্তমান শ্রাবণের "প্রবাসী" পত্রিকায় "বৈষ্ণব-কবিতা" নাম দিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। অজিত বাবু এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব-কবিতার সম্বন্ধে যে কতকগুলি অসঙ্গত ও অমূলক দোষারোপ ও সত্যের অপলাপ করিয়াছেন—তাহার ফলে আমাদিগের দেশে বৈষ্ণব-কবিতার সমাদরের বিশেষ কোন হানি হইবে—এরূপ আমরা বোধ করি না; তবে অজিত বাবুর মত সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিও যে এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করিতে পারেন—ইহা দেখিয়া আমরা নিতান্তই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদিগের মোটামুটী যাহা বলিবার আছে—তাহা শুনিলে অজিত বাবু বা তাঁহার সম-ধর্ম্মা ব্যক্তিগণের মত পরিবর্ত্তিত হইবে কি না, জানি না—তথাপি কর্ত্তব্য বোধে এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আমরা আজ শিক্ষিত সাহিত্য-সেবীদিগের নিকট নিবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছি।

প্রথমেই বলা উচিত যে, অজিত বাবুর প্রবন্ধটি এরূপ এলো-মেলো ভাবে রচিত যে, ঐ প্রবন্ধ হইতে শ্রেণী-বদ্ধ-ভাবে তাঁহার আপত্তিগুলি এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পরে ক্রমান্বয়ে উহাদিগের উত্তর দেওয়া চলে না; সুতরাং আমরা অগত্যা অজিত বাবুর এক একটি আপত্তি—তাঁহার কথায় উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগের বক্তব্য বলিয়া যাইব। ইহাতে আর যাহা হউক—সমালোচনায় অজিত বাবুর আপত্তিগুলি ঠিক-ঠিক বলা হয় নাই, এই অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

অজিত বাবু প্রথমেই লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, আমাদের দেশের কোন কোন সাহিত্যিক বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যেই গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপ ফুটিয়াছে এবং বৈষ্ণব-কবিতার তত্ত্বের মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁদের বিবেচনায় 'বাংলা-কবিতার প্রাণ ও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ' সমস্তই ঐ বৈষ্ণব-কবিতায়

---

* বগুড়ায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে দশম অধিবেশনে পঠিত।

মধ্যেই মেলে, কোন কোন বৈষ্ণব-কবিতার মত 'কোন দেশের সাহিত্যেই আজ পর্য্যন্তও সৃষ্ট হয় নাই' এবং 'বাঙ্গালায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গালার দীপ নিভিয়া গেল।' অর্থাৎ প্রতীচ্যের সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের মতে সেটা কিছুই নয়—'বাংলা কবিতার প্রাণ' তার মধ্যে আদপেই নাই।"

আমরা যতদূর জানি—অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব-কবিতার উৎকর্ষের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া থাকিলেও বাঁকীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে দাশ মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন—উহাতে বৈষ্ণব-কবিতার এই অসাধারণ বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের সেই অভিভাষণের প্রদর্শিত বিশ্লেষণ বা বিচার-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া অজিত বাবু সেই সুদীর্ঘ অভিভাষণের কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দুই তিন ছত্রের মধ্যে সেই অভিভাষণটির যে তাৎপর্য্য নিষ্কাশিত করিয়াছেন, উহাতে সাহসিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেও সহৃদয়তা বা সত্যপ্রিয়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। "প্রতীচ্যের সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—সেটা কিছুই নয়—'বাংলা কবিতার' প্রাণ তার মধ্যে আদপেই নাই"—ঠিক এরূপ কথা অভিভাষণে আছে কি? দাশ মহাশয়ের রচিত কাব্যগুলি কি সম্পূর্ণ প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব-বর্জ্জিত? প্রতীচ্য-সাহিত্য আমাদের দেশে প্রচারিত হওয়ার পর উহাতে সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে বিমুক্ত থাকিয়া কাব্য রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে কি?—যদি তাহা না হইয়া থাকে—তবে ত সভাপতি মহাশয়ের বাংলা কাব্যেও "বাংলা কবিতার প্রাণ" আদপেই নাই এবং সেটা বাংলা কাব্যের হিসাবে কিছুই নয়! আমরা মনে করি, নিরপেক্ষ-ভাবে উক্ত অভিভাষণের উক্তিগুলির পর্য্যালোচনা করিলে অল্পবুদ্ধি লোকেও বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাকে কিছু নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করা কিংবা বাংলা কবিতার প্রাণ তার মধ্যে আদপেই নাই বলিয়া উহাকে উক্ত অভিভাষণে তুচ্ছ করা হয় নাই;—সেরূপ করাও সম্ভবপর নহে। অভিভাষণের এ অংশের প্রতিপাদ্য এই যে, প্রকৃত "বাংলা কবিতার প্রাণ ও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ" বৈষ্ণব-কবিতায় যেমন মিলে, আধুনিক বাংলা কবিতায় তেমন মিলে না। বৈষ্ণব-কবিতার তুলনায় এ হিসাবে আধুনিক বাংলা কবিতা নগণ্য—উহাতে খাঁটি বাংলার প্রাণের কথা সম্পূর্ণ দূরে থাকুক, আংশিক খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তি কি অমূলক? বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-কবি ও অদ্বিতীয়

সমালোচক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বযুগের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সমালোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, অজিত বাবু কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলার তাৎপর্য্য কি ইহাই নহে যে,—ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় 'বাংলা কবিতার প্রাণ' যতটুকু ফুটিয়াছে, পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কাব্যেও ততটুকু ফোটে নাই। অথচ আবার হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের কবিদিগকে সেই বঙ্কিম বাবু অন্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বর গুপ্তের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর এই সমালোচনার যথার্থতা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই! তবে প্রকারান্তরে প্রায় সেইরূপ কথা বলায়, অজিত বাবু আজ সভাপতি মহাশয়ের সে উক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন কেন?

সে যাহা হউক, অজিত বাবু উক্ত অভিভাষণের এই গভীর সত্যমূলক উক্তিটির সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা না করিয়া—বৈষ্ণব-কবিতার মত রস-রচনা 'কোন দেশের সাহিত্যেই আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই'—এই উক্তিটি যে সর্ব্বথা অমূলক, তাহাই সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমালোচনার ২য় দফায় লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের বিচার পরে হইবে, আগে সাহিত্য-হিসাবে বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করা যাক। কেন না, এটা সত্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কবিতার অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের ভণিতার অনেক আগেই তৈরি। তার পর বৈষ্ণব-তত্ত্ব বলিলে ত কোন এক জন তত্ত্ব-কারের রচনা বুঝায় না—তার মধ্যেও নানা সম্প্রদায় ও শাখা-সম্প্রদায় আছে। যথা, রামানুজী, বল্লভী, জীব গোস্বামী সম্প্রদায় এবং এদের আবার নানা শাখা-সম্প্রদায়।—এই নানা দলের নানা জটিল মতামতের ঋজু-কুটিল পন্থার ভিতর দিয়া গেলে তবে বৈষ্ণব-তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তার পর বৈষ্ণব-সাধনারও বিস্তর ভেদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দেখি; সহজে সাধনাকে মহাজন সাধকেরা নিন্দাই করিয়া থাকেন। অথচ মহাজন সাধনার অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে সহজেরা দিব্য প্রাকৃত ও সহজ করিয়া লওয়ার চেষ্টায় আছে এবং এ ক্ষেত্রে অপ্রাকৃতের চেয়ে প্রাকৃতের পরেই প্রাকৃত জনের মনের টানটা যে বেশী, তা বাংলা গ্রামের ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন। এ সব তত্ত্ব ও সাধনার পর আবার এখনকার ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীদের হাল-ফ্যাসানের বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও সাধনা আছে। পুরানো সাধনা ও তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল নাই, কারণ, তাতে এ কালের শিক্ষিত লোকের দিল খোলে না। তাঁরা বৈষ্ণব-সাধনাকে যতটা জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ান, জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক সে সাধনা ততটা জড়িত নয়। কিন্তু এ সব তত্ত্ব সময়ক্রমে আলোচনা করা যাইবে; উপস্থিত মত বৈষ্ণব-কবিতাকে শুধু সাহিত্য হিসাবে আলোচনা করিলে কাহারও আপত্তির কোন কারণ দেখি না।"

আমরা জানিতাম যে, এইরূপ একটি জটিল বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে হইলে আগে সেই বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কে কি বলিয়াছেন, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। স্ব-মতের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলির বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করা আবশ্যক;—কেন না, এইরূপ বিষয়ে কোন যুক্তি-তর্কের ভিতর না যাইয়া সহজ জ্ঞানে (intuitively) একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, এরূপ শক্তি প্লেটো, এরিষ্টটল, ব্যাস বা শঙ্করাচার্য্যের মধ্যেও দেখা যায় নাই। অজিত বাবু অবশ্য প্লেটো বা শঙ্করাচার্য্য হওয়ার দাবি করেন না—সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সম্বন্ধে এক নিশ্বাসে এতগুলি গুরুতর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে তিনি যে তাঁহার যুক্তিগুলি প্রদর্শিত না করিয়া—উহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখিয়াছেন—ইহা কিরূপ হইল? যে সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন যুক্তি-তর্ক নাই—উহার খণ্ডন জন্যও কোন যুক্তি-তর্ক-প্রদর্শন অনাবশ্যক। তবে এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে অজিত বাবুর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি নিতান্ত অমূলক। বৈষ্ণব-কবিতার অধিকাংশই 'গৌড়ীয় রসতত্ত্বের ভণিতার (?) অনেক আগে তৈরি' হওয়া দূরে থাকুক—কেবল মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলি ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রচলিত সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদরূপ গোস্বামীর রচিত "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" ও "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রসগ্রন্থদ্বয়ের পরবর্ত্তী রচনা। চণ্ডিদাস যদিও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক—কিন্তু তাঁহার প্রচলিত পদাবলি যে তত প্রাচীন নহে, উহা যে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে—তাহা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডিদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের ভূমিকায় অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের সহিত চণ্ডিদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তাহা অজিত বাবুও বোধ হয় অনুভব করিয়াছেন;—কেননা, তিনি সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে চণ্ডিদাসের পদাবলিই আধ্যাত্মিকতা হিসাবে উৎকৃষ্ট এবং উহার মধ্যে দশ কি পনেরটি পদ অতি চমৎকার ও বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, চণ্ডিদাসের নবপ্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ শুধুই দৈহিক বিকারের বর্ণনা। এরূপ বর্ণনা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডিদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থে যেমন আছে, Havelock Ellis এর Sex-psychology ছয় ভলিউম বা কাম-শাস্ত্র পুস্তকেও তেমন পাওয়া যাইবে না।" আমরা অজিত বাবুর এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে পরে বিচার করিব; এই স্থলে কেবল ইহাই

বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের এই "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন"ই তাঁহার খাঁটি রচনা; তাঁহার প্রচলিত পদাবলি সমস্তই অল্লাধিক পরিমাণে পরবর্ত্তী রূপান্তর মাত্র। সুতরাং সত্যকথা বলিতে গেলে—বাঙ্গালী বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের প্রচলিত কোন পদই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের গণ্ডীর বাহিরের নহে। তার পর বক্তব্য, এই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের কথা আরম্ভ করিয়া অজিত বাবু 'রামানুজী, বল্লভী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব তত্ত্বকারের (?) প্রসঙ্গ তুলিলেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রণীত বৈষ্ণব-'রসতত্ত্ব' ও "রামানুজী, বল্লভী, জীবগোস্বামী সম্প্রদায়" কর্তৃক প্রচারিত "বৈষ্ণব তত্ত্ব" কি এক জিনিষ? সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বৈষ্ণব-কবিতা, বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব ও কিছু কিছু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া, এতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বে—জগতের প্রাচীন ও নব্য সমস্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বের ন্যায় "নানা জটিল মতামত" ও "ঋজু-কুটিল পন্থা" থাকিলেও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বে' সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মতভেদ নাই। বৈষ্ণব-কবিতার সহিত সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বেরই সম্বন্ধ—বৈষ্ণব ধর্ম্ম-তত্ত্বের সেইরূপ সম্বন্ধ নাই; কেন না, দার্শনিক হিসাবে ধর্ম্ম-তত্ত্ব যে কবিতার প্রতিপাদ্য নহে—এই আলঙ্কারিক তত্ত্বটি প্রায় দুই হাজার বৎসর হইতে,—নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির সময় হইতে ভারতীয় সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব-দাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক বৈষ্ণব কবিরা পর্য্যন্ত কেহই পদাবলি রচনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া—বৈষ্ণব-কবিতা কিংবা বৈষ্ণব সাধনার সহিত বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। অজিত বাবু "মহাজন সাধনার অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলা" বাক্যের দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন, ঠিক বলিতে পারি না। "অপ্রাকৃত" শব্দের প্রকৃত অর্থ "অলৌকিক"; বৈষ্ণব-সাহিত্যেও এই অর্থেই "অপ্রাকৃত" শব্দের ব্যবহার হয়;—যেমন "শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত মদন" এই বাক্যের অর্থ এই যে, শ্রীবৃন্দাবনে মদনের কর্ত্তব্য চিত্তবিমোহন কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অলৌকিকভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন—সেখানে কামোদ্দীপক প্রাকৃত কন্দর্পের অধিকার নাই। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের লীলার অর্থ—দেহধারী শ্রীভগবান্ ও তাঁহার দেহ-ধারিণী পরাশক্তির লীলা; ইহাতে অব্যক্ত ও ব্যক্ত—কিংবা অন্য কথায় অলৌকিক ও লৌকিক ভাব অবশ্যই আছে। অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ভাবটিকে আশ্রয় করিয়াই লৌকিক বা প্রাকৃত ভাবটি টিকিয়া আছে। অন্যান্য স্থলের ন্যায় এ স্থলেও যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা প্রধানতঃ অপ্রাকৃত ভাবের উপাসক হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাবকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা নিগূঢ় অপ্রাকৃত ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া—

কেহ বা তৎপ্রতি অন্ধ বিশ্বাসে শ্রদ্ধাবান্, কেহ বা তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া প্রবৃত্তি-বশে অভীষ্ট প্রাকৃত সাধনা-মার্গেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মে—সকল প্রকার সাধনায়ই এরূপ তত্ত্বদর্শী ও স্থূলদর্শী উভয় শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে; অজিত বাবু এ জন্য বৈষ্ণব-সাধনার প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন কেন? তিনি কি করিয়া জানিলেন যে, ইংরেজী-শিক্ষিত হাল ফ্যাসানের বৈষ্ণব বাঙ্গালীরা "বৈষ্ণব-রস-সাধনাকে যতটা জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ান, জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক সে সাধনা ততটা জড়িত নয়।" শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে—তিনি কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের সেই রস-সাধনার সহিত তাঁহাদের জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ যোগ বা সামঞ্জস্য ছিল না? যদি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে, শ্রীচৈতন্য-দেব ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর পক্ষে প্রাচীনকালে যাহা সত্য ছিল—এখন উহাই অসত্য হইয়া পড়িয়াছে? কোন ধর্ম্ম বা সাধনার বাহিক আচরণ সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু উহার যাহা অপ্রাকৃত অংশ বা সার-ভাগ, তাহা ত চিরকালের জন্যই সত্য ও অবিনশ্বর থাকিবে! বর্ত্তমান যুগের যুক্তিবাদী বহু মনীষী সমালোচকও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বের ও বৈষ্ণব-রস-সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—অজিত বাবু কি তাহা জানেন না? অজিত বাবু সাহিত্যিক হিসাবে বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বের, এমন কি, বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের আলোচনা করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন; আমরাও বলি "তথাস্তু"। তবে 'ধান ভানিতে শিবের গীত' কেন? অজিত বাবু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্ব, রস-তত্ত্ব ও রস-সাধনা সম্বন্ধে এই সকল খামখেয়ালি কথা লিখিয়া বিদ্বেষ-ভাব ও অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

অতঃপর অজিত বাবু "চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির রচনাগুলি নাড়াচাড়া" করিয়া "সাহিত্য হিসাবে তাদের কতটুকু মূল্য যাচাই করিয়া পাওয়া যায়"—সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আগেই প্রতীচ্য কবিতার সহিত তুলনার বিরোধী এক শ্রেণীর কল্পিত সমালোচকের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন—"তবে যাঁরা মনে করেন যে, বাংলা দেশটা বিশ্বের চেয়ে বড়, যা নাই ব্রহ্মাণ্ডে তা এই দেশের ভাণ্ডের মধ্যে খাতির-জমা হইয়া আছে, সুতরাং এখানে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সহিত তুলনা না করিয়াই সে সব সাহিত্যের চেয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কলরব করিলেই সে কলরবটা ক্রমশঃ জনরবে পরিণত হইয়া অকাট্য সত্য হইয়া বসিবে—তাঁদের সঙ্গে আমার কোন তর্ক নাই। তাঁরা বিশ্বকে ছাড়িয়া স্ব স্ব দেশের বিবরের মধ্যে চোক-কান বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকুন, বিশ্বের কোন খবর সেথায় যেন না পৌঁছায়।"

কেবল বাংলা কবিতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—এমন কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রের যে এ দেশে সৃষ্টি হইয়াছে,—কিংবা কোন সমালোচক বাংলা কবিতাকে বিশ্ব-সাহিত্যের যাচাইয়ের হাটে লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়াছেন—এরূপ খবর অজিত বাবু কোথায় পাইলেন? না পাইয়া থাকিলে—এরূপ অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক কথায় প্রবন্ধ পূর্ণ করাই কি অজিত বাবুর সমালোচনার আদর্শ? সে যাহা হউক—এবার তিনি সত্য সত্যই বৈষ্ণব-কবিতার দর যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভূমিকা করিতেছেন—"বৈষ্ণব-কবিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাৎসল্য ও মধুর রসের কবিতা।" * * * * "প্রথমে সখ্য-রসই দেখা যাক।" "সখ্যরসের কবিতা বৈষ্ণব-কবিতায় নাই বলিলেই হয়, যাহা আছে, তাহা এত অল্প যে, তাহা পড়িয়া কোন তৃপ্তিই হয় না। বলরাম দাসের কতক কতক কবিতায় একটুখানি সখ্যরসের আস্বাদন হয় মাত্র। যেমন—

'ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ-বালক
বৈঠল নীপক ছায়।' ইত্যাদি

কিংবা শ্যামের—

'প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥' ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণ সুদামের কোলে শুইয়া আছেন আর শ্রীদাম তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের মুখ রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীদামের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এর চেয়ে বড় সখ্য-রসের কল্পনা বৈষ্ণব-কবির নাই।"

অজিত বাবু পদকল্পতরুর ৩য় শাখার একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি পল্লবের সখ্য-রসের পদগুলি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন কি? পড়িয়া থাকিলে তিনি সখ্য-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ঘনরাম দাসের অপূর্ব্ব পদাবলী কিংবা বলরাম, প্রেমদাস, যাদবেন্দ্র, শিবাই প্রভৃতি পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট পদগুলির উল্লেখ না করিয়া অতি সাধারণ ও চল-সই দুইটি পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন কেন? বৈষ্ণব-কবিদিগের সখ্যরসেরও সুন্দর সুন্দর এত পদ ও পদাংশ আছে যে, তাহা উদ্ধৃত করিলে উহা দ্বারাই একটি প্রবন্ধ পূর্ণ করা যায়। যদি অজিত বাবুর এই সকল খুঁজিয়া লওয়ার সুবিধা না হয়—তাহা হইলে তিনি গত ১৩২১ সালের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকার পৌষ ও মাঘের সংখ্যার "বৈষ্ণব-পদাবলির রস-বৈচিত্র্য" (বাৎসল্য ও সখ্য-রস) প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলে তাঁহার ভ্রান্তি দূর হইবে। অজিত বাবুর ন্যায় যাঁহাদিগের পদাবলি—সমুদ্রমন্থন করিয়া রত্ন-সংগ্রহ করার উপযোগী ধৈর্য্য বা চেষ্টা নাই—তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-কবির অতুলনীয় বাৎসল্য ও সখ্য-রসের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা ঐ প্রবন্ধ দুটি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।

অজিত বাবু অতঃপর লিখিয়াছেন—"সখ্য-রসের কবিতা পড়িতে হইলে পারস্য কবিতা, বিশেষতঃ হাফেজের কবিতায় যাইতে হয়। * * * হাফেজের কবিতায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ দুই সখার সম্বন্ধ—পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়। জড়-জগতের ও অধ্যাত্ম-জগতের সকল সৌন্দর্য্য সেই সখার মুখজ্যোতির ছটা।" অজিত বাবু উদাহরণস্বরূপ হাফেজের কয়েকটি কবিতাংশের বাংলা তরজমা দিয়াছেন। হাফেজের কবিতার উপাদেয়তা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। তবে এ স্থলে আমরা এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, হাফেজের ন্যায় একজন জ্ঞানী ও প্রেমিক ভক্ত যে ভাবে তাঁহার প্রিয়তমের নিকট নিজের প্রাণের কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন—অজিত বাবু কি ব্রজ-বালকদিগের মুখে সেইরূপ প্রবীণের উক্তি শুনিবার আশা করেন? যদি হাফেজের বা হুইট্‌ম্যানের সহিত বৈষ্ণব-কবিতার সাদৃশ্য দেখিতে চাহেন—তাহা হইলে পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ৩৬শ পল্লবে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদ-কর্ত্তার, বিশেষতঃ নরোত্তম দাসের 'প্রার্থনা-নির্ব্বেদ,' 'দৈন্য-বোধিকা প্রার্থনা,' 'সাধন-লালসাময়ী প্রার্থনা' বিষয়ক পদগুলি পাঠ করুন। এ সকল বিষয়েও বৈষ্ণব কবির এত সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে যে, উহার সহিত ঐ ভাবের যে কোন বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে।

তার পর বাৎসল্য রস। অজিত বাবু প্রথমে লিখিয়াছেন—"এ রসে অবশ্য বাঙ্গালীর জিৎ, তাহা মানিতেই হইবে।" কিন্তু সেই দফারই মধ্যভাগে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, "বালক কৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখানো প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যের অবতারণা বৈষ্ণব-কবিতায় শেষাশেষি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ—বৈষ্ণব-কবিদিগের কেবলি ননী-ছানা চুরি এবং যশোদার তাতে প্রশ্রয় (?) এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্র বেশে সাজানো ইত্যাদি ঘোরো বাল্যলীলার কথাই পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মূল্যই থাকুক, কাব্য-হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম।" দৃষ্টান্তস্থলে অজিত বাবু কতকগুলি ইংরেজী কবিতার অপূর্ব্ব বাৎসল্য-রসের উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার জো নাই—কারণ, তিনি প্রতীচ্য কবিতার নকল করিয়া নাকি প্রতীচ্যদেশে যশস্বী হইয়াছেন, কেননা, প্রতীচ্য দেশের লোকেরা তাঁহাদের কাব্যের নকলটা ধরিতে পারে নাই,—নহিলে বলিতাম যে, 'শিশু' কাব্যে যে বাৎসল্য-রস আছে—শুধু একটি কবিতা 'জন্ম-কথায়' শিশুর আবির্ভাবের অনির্ব্বচনীয় রহস্যের যে সংবাদ আছে—সমস্ত বৈষ্ণব-পদাবলীতে তাহা কোথাও নাই।

'ছিলি আমার পুতুল খেলায়
ভোরে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি!

তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি'।" ইত্যাদি

অজিত বাবুর এই সৃষ্টি-ছাড়া সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। অজিত বাবুর উল্লিখিত ইংরেজী কবিতাগুলির কিংবা ঐ সকল কবিতার সাদৃশ্যযুক্ত রবীন্দ্র-নাথের উদ্ধৃত কবিতায় "শিশু-জন্মের অনির্ব্বচনীয় রহস্য" আছে কি না, সে কথা লইয়া তর্ক উঠাইব না। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, এই সকল কবিতায় আধুনিক শিক্ষিতা মাতার মাতৃত্বের রহস্যময় কল্পনাটি কবিত্বের ভাষায় বেশ ফুটিয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণব-কবির বর্ণিত যশোদার বাৎসল্য এরূপ কাল্পনিক বস্তু নহে · উহা সনাতন মাতৃহৃদয়ের সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল কালে ও সকল সমাজে কবিতার বিকাশ একরকমে হয় না এবং কবিতার ভাব এক রকমে ফোটে না। বিভিন্ন দেশের কথা দূরে থাকুক—এক ইংরেজী সাহিত্যেই চসার, মিল্টন, শেলী, কীটস্, টেনিসন্ এবং ব্রাউনিং প্রভৃতির মধুর-রসের বর্ণনা এক প্রকার কি?

বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশের ন্যায় কবিতারও একটা দিক্ ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীন; ইহাকে কবিতার জ্ঞানের দিক্ (intellect) বলা যাইতে পারে। কবিতার আর একটা দিক্ আছে, উহাকে কল্পনার (imagination) এর দিক্ বলা যায়। জগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি ক্রমশঃ স্থূল (concrete) হইতে সূক্ষ্ম (abstract) বিষয়ের ধারণায় অধিক অভ্যস্ত হইতে থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম; অসাধারণ মনীষীদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও—সকল দেশের সাহিত্যের সাধারণ নিয়মটি যে সত্য, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু Imagination বা কবিত্বের মূলীভূত মনন-শক্তিটি যে সভ্যতার বিকাশের সহিত সর্ব্বদাই অধিক বিকাশপ্রাপ্ত হয়—ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কুতর্ক ধরিয়া অসভ্য সমাজের দৃষ্টান্ত তুলিবেন না। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও টেনিসন্, মিল্টন ও সেকস্পীয়ার হইতে, কিংবা সেইরূপ হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস হইতে সাধারণ সভ্যতায় ও অনেক বিষয়ের জ্ঞানে অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা যে সে জন্যই তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত কবিগণ হইতে কবিত্বের মূলীভূত মনন-শক্তিতেও শ্রেষ্ঠ হইবেন, এমন কোন কথা নাই। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিগণ অপেক্ষা আধুনিক সাধারণ কবিরাও অনেক বিষয়ে সূক্ষ্ম বা abstract ভাবের ধারণা ও প্রকাশে অধিক পটুতার পরিচয় দিয়া থাকেন। মনীষী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কবিতা ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি নব্য কবিদিগের কবিতার প্রকৃতিগত

পার্থক্য সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কবিদিগের কবিতার বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ; কিন্তু তাঁহাদিগের রসানুভূতি অত্যন্ত তীব্র। নব্য কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয় খুব ব্যাপক—কিন্তু রসানুভূতি সেরূপ তীব্র নহে। প্রাচীন কবিতার সঙ্কীর্ণ জল-প্রবাহ নব্য কবিতায় বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়ায় উহার গভীরতা ও বেগশালিতার পরিবর্ত্তে যেন ব্যাপকতা ও প্রশান্ততা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা প্রাচীন ও নব্য কবিতার এই প্রকৃতিগত পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া উভয়বিধ কবিতার রসাস্বাদনে অভ্যস্ত হন নাই—তাঁহাদিগের নিকট এরূপ একতরফা আলোচনা ব্যতীত—নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

অতঃপর অজিত বাবু বৈষ্ণব কবিতার মধুর-রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া—"বৈষ্ণব কবিদিগের ব্যক্তিত্বের আভাস টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; ব্যক্তিত্বের পূরা চেহারা দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব-কবিতা ব্যক্তিত্বের কবিতা হয় নাই" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সম্পূর্ণ অভাবই যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার বিশেষত্ব—জগতে দুই চারি জন মহাকবি—যেমন হোমর, সেকস্‌পীয়র, বাল্মীকি, কালিদাস ব্যতীত আর কেহ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—অজিত বাবু ব্যক্তিত্ব প্রধান গীতি কবিতার প্রতি পক্ষপাত হেতু—তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন! কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি গীতি-কবিদিগকে এই হিসাবে সেকস্‌পীয়র, কালিদাস প্রভৃতির সমকক্ষ বলিতেছি। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি হইয়াও অতুলনীয় নাট্যকার সেকস্‌পীয়র ও কালিদাসের ন্যায় যে গীতি-কাব্যেও ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে অব্যক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন—আমাদিগের বিবেচনায় কেবল ইহাই তাঁহাদিগের কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এবার অজিত বাবু বৈষ্ণব কবিতার ত্রিদোষ-ক্ষেত্র বা plague-spotএ আসিয়া পড়িয়াছেন আর সকল যেমন হউক,—বৈষ্ণব-কবিতা যে ভয়ানক অশ্লীল এবং সে জন্য ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য—সে কথার উত্তর কি? এ সম্বন্ধে অজিত বাবুর উক্তি মোটামুটি এই—

"রাধা-কৃষ্ণের গোপন প্রণয়ের ঐ কাহিনীটা এমনি ঘোরতর যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী যে, তাহার বর্ণনায় কাম-শাস্ত্রের মাল-মসলা জোগানো ছাড়া উচ্চ মানব-প্রেমের বিশেষ কোন মালমসলা জোগানো যায় না।" শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁর নব প্রকাশিত Love in Hindu Literature নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"The Padavalis are the songs of delight in flesh."

পুনশ্চ স্থানান্তরে—

"আমি বিনয় বাবুর সঙ্গে একমত হইয়া বলি যে, বিদ্যাপতির এই সব কবি-

তার মধ্যে কোন কালেই কোন রূপক ছিল না বা নাই—এ সব কবিতা নিছক কামের কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয় বাবু ঠিকই লিখিয়াছেন—'Vidyapati is a professor of Kam-shastra."

কাব্যের শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বিচার করিতে হইলে সনাতন আদর্শ (Standard) কি হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে কাব্য-কলার সৌন্দর্য্যে ও ধর্ম্মনীতির মঙ্গলের মধ্যে কোন চিরন্তন বিরোধ আছে কি না, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা এ হিসাবে নিন্দনীয় কি না—আমরা "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" গ্রন্থের ভূমিকায় সে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ স্থলে ঐ সকল বিষয়ে পুনরায় দার্শনিক তর্ক (Academical discussion) উঠাইব না। অজিত বাবু যেমন বিনয় বাবুর সাক্ষ্য দ্বারা স্ব-মতের পোষকতা করিয়াছেন—আমরাও সেই নজীরের আপাততঃ তাঁহাদিগের গুরুস্থানীয় একজন প্রতীচ্য মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের অসারতা প্রদর্শন করিব।

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, সেই মনীষী স্যর গ্রিয়ারসন্ মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Maithil Chrestomathy" নামক গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"It now remains to consider the matter of Bidyapati's poems. They are nearly all Vaishnava hymns or Bhajans, and as such belong to a class well known to students of modern Indian Literature. They cannot be judged by European rules of taste, and must not be condemned too hastily as using the language of the brothel to describe the soul's yearnings after God. Now that the Aphorisms of Sandilya have been given in an English dress by Mr. Cowell, no one need plead ignorance of the mysteries of the Indian doctrine of faith. "God is Love" is alike the motto of the Eastern and the Western worlds, while the form of love proposed is essentially different. The people of a colder western clime have contented themselvs with comparing the ineffable love of God to that of a father to his children, while the warmer climes of the tropics have led the seekers after truth to compare the love of the worshipper for the worshipped to that of the Supreme Mistress Radha for her Supreme Lord Krisna. It is true that it is hard for a western mind to grasp this idea, but let us not therefore hastily condemn it : the glowing stanzas of Bidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest.

অজিত বাবু কেবল বিদ্যাপতিকে গালি দিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—সর্ব্বজন-সমাদৃত Songs of Solomon সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন—"এ সব কবিতার সঙ্গে Songs of Solomon অথবা 'শৃঙ্গারশতক' অথবা কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি লালসা-মূলক কবিতার তুলনা চলে; কিন্তু তাও ঠিক চলে না। কারণ, ঐ সব কবিতার মধ্যে কল্পনার দিকটা বেশ আছে, তা ছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-রস প্রচুর-পরিমাণেই আছে। বৈষ্ণব-কবিতায় তা নাই; এ শুধুই দৈহিক বিকারের বর্ণনা।" ইত্যাদি—

যে বৈষ্ণব-কবির কবিতা নানা বিচিত্র কল্পনা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রসের প্রাচুর্য্যের জন্যই সুবিখ্যাত—উহাই আজ অজিত বাবুর ও বিনয় বাবুর নিকট শুধু অশ্লীল ও কামোদ্দীপক বর্ণনা বলিয়া গণ্য হইল! অজিত বাবু অতঃপর লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতি এইরূপ একান্ত ইন্দ্রিয়ভোগের কবি হইলেও তাঁহার কবিতার মধ্যে খাঁটি সাহিত্য-রস আছে। জয়দেব ছাড়া এমন পদ-লালিত্য, ছন্দের এমন ঝঙ্কার আর কোন বৈষ্ণব-কবিরই নাই। অবশ্য, সে ঝঙ্কার ও শব্দ-লালিত্যও কেবল কানেরই জিনিষ—কানকেই সুখ দেয়, প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।"

অজিত বাবুর এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? তিনি বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে "খাঁটি সাহিত্য-রস আছে" বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার তখনি বলিতেছেন যে, উহাতে পদলালিত্য ও শব্দের ঝঙ্কার ছাড়া প্রাণের জিনিষ কিছুই নাই। অজিত বাবুর অলঙ্কার-শাস্ত্রে কি কেবল পদলালিত্য ও শব্দের ঝাঙ্কারেই খাঁটি সাহিত্য রস-সৃষ্ট হয়? বোধ হয় সেইরূপই হইবে; নতুবা প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে না পারিলেও বিদ্যাপতির কবিতা যে কিরূপে খাঁটি সাহিত্য-রসের আধার হইতে পারে, তাহা প্রতীচ্য বা প্রাচ্য কোন মনস্তত্ব বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্রের সাহায্যে বুঝা যায় না।

অজিত বাবু সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে চণ্ডিদাসের যে "বড় জোর দশটি কি পনেরটি" কবিতায় প্রকৃত কাব্য-রসের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥"

পরীতি বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর ॥”

“পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ ॥”

উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলির দ্বারা অজিত বাবু শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিতে কি বুঝেন, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীচ্য কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গোঁড়া শিষ্যগণ তাঁহার যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক কবিতার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মনীষী সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের. মতে যাহা প্রকৃত-পক্ষে কাব্য-রস-বর্জ্জিত—চণ্ডিদাসের উদ্ধৃত কবিতাগুলির দুই একটি বাদে বাকি কবিতাগুলিকে আমরাও প্রায় সেই শ্রেণীরই মনে করি। দার্শনিক তত্ত্বের হিসাবে উহাতে প্রাণের কথা—প্রেমের কথা আছে বটে, কিন্তু কাব্যের সারভূত ব্যঞ্জনা বা Poetic imagination এর হিসাবে উহার মূল্য নাই বলিলেই হয়; যাহা একটু আছে, প্রতীচ্য সমালোচনার ভাষায় উহাকে উচ্চ অঙ্গের imagination না বলিয়া poetical conceit বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। অজিত বাবু যদি তাঁহার প্রীতিকর এই তথাকথিত আধ্যাত্মিক শ্রেণীর কবিতার প্রতি একান্ত পক্ষপাতী না হইয়া :নিরপেক্ষভাবে ব্যঞ্জনা-প্রধান উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে চণ্ডিদাসের—সখা হে ও ধনী কে কহ বটে’ ইত্যাদি যে পদটির তিনটি কলি ছাড়া তিনি বাকি অংশ সুরুচির খাতিরে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই, সেই পদের—

“চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর ॥”

কলিটিতে প্রেমোচ্ছ্বাস ও কাব্যকলার অতুলনীয় মণিকাঞ্চনযোগ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এখানে হৃদয়ের গভীর.আকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছ্বাস ত তথা-কথিত আধ্যাত্মিক ভাষায় ব্যক্ত করা হয় নাই—এখানে যে উচ্ছ্বাস ও কাব্যকলা কল্পনার প্রভাবে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে! এবংবিধ কবিতার প্রকৃত রসাস্বাদনের অধিকার

অতি অল্প লোকেরই আছে। প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য সমালোচক Theodore Watts Encyclopædia Britanica গ্রন্থে কবিতার বিচার-প্রসঙ্গে গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ কবি স্যাফোর কবিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

The most truly passionate poet in Greece was no doubt in a deep sense the most artistic poet; but in her case art and passion were one and that is why she has been so cruelly misunderstood."

স্বীকার করি যে, এই তথা-কথিত আধ্যাত্মিকতার কবিতা বৈষ্ণব-পদাবলিতে বড় বেশী নাই—কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা ইহাকে প্রকৃতপক্ষে উচ্চ অঙ্গের রসরচনা বলিয়াই গণ্য করেন নাই—ইহা মধুর-রস-বিষয়ক কবিতা হইলেও বিভাব-অনুভাবাদির সাহায্যে এখানে মধুর-রসের ব্যঞ্জনা না হইয়া বরং 'স্ব-শব্দ বাচ্যতা'-নামক অলঙ্কার-দোষই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণবকবির কবিতার শ্রেষ্ঠ বিষয় প্রেমানুভূতি ও প্রেম-তন্ময়তা। উহা প্রকাশ করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-কবি কোথায়ও কবিতার স্বাভাবিক ভাষা ছাড়িয়া—দার্শনিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। অজিত বাবু চণ্ডিদাসের যে কয়েকটি কবিতায় এই দার্শনিকতার গন্ধ পাইয়াছেন—তাহা যে চণ্ডিদাসের নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী সহজিয়া বা রাগাত্মিক-পন্থীদিগের কৃত প্রক্ষেপ, তাহা "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থ আবিষ্কারের পরে প্রমাণিত করা তেমন কঠিন নহে। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনা-প্রসঙ্গে সময়ান্তরে সে সম্বন্ধে বিচার করিব। এ স্থলে কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিতার পরিচয় দিতে হইলে সমালোচক মহাশয়ের দৃষ্টিকে আর একটু উদার করিতে হইবে! Havelock Ellisএর Sex Psychology ছয় ভলুম বা কামশাস্ত্র পাঠ করিতেও যখন তাঁহার বিরক্তির কারণ হয় নাই—তখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি পুনরায় বৈষ্ণব-কবিতা অধ্যয়ন করুন। কোন স্থানে সন্দেহ হইলে বরং উহা স্যর রবীন্দ্রনাথের নিকট বুঝিয়া লইবেন। অজিত বাবুর অবগতির জন্য আমরা বলিয়া দিতেছি—বহুদিন পূর্ব্বে স্যর (তখনকার বাবু) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সাহচর্য্যে বৈষ্ণব-কবিতা পাঠের সুবিধার জন্য "পদরত্নাবলী" নাম দিয়া পনের কি কুড়ি জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবির শতাধিক পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশ্য, যেখানে দীনেশ বাবুর মত সাহিত্য-সমালোচক প্রায় তিন হাজার পদ-পরিপূর্ণ পদ-কল্পতরুর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়াছেন,—"পদকল্পতরুর প্রতি পত্রেই এমন দুই.একটি ছত্র বা পদ আছে—যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন"—সেখানে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের সেই সংগ্রহটিকে খুব সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বলিয়া অভিহিত

করি, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা আমাদিগের ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে শতাধিক রত্ন দেখিয়াছেন—সেখানে রবীন্দ্র শিষ্য উহার এক-চতুর্থাংশও দেখিতে পান নাই। এ জন্যই বোধ হয়, প্রবাদ আছে যে—"শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।"

অতঃপর অজিত বাবু—"অতএব বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে একা চণ্ডিদাসের কতক কতক কবিতারই বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং বিদ্যাপতির দু একটা পদেরও হইতে পারে দেখা গেল। তার পর জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসেরই ছায়া। তবু তাঁদেরও দু একটা পদ খুবই চমৎকার এবং চিরকাল আদরের যোগ্য।"—এইরূপ চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া—এই বলিয়া একটু শান্তি পাইয়াছেন যে—"যিনি যাই বলুন, এটা ঠিক জানি যে, ভাবী বাংলা কবিতার ধারা আর রাধিকার নব নব 'রূপান্তর' ঘটানতে নিযুক্ত থাকিবে না।" মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা কি রাধিকার "রূপান্তর" ঘটানতেই নিযুক্ত ছিলেন?—না থাকিলে ভবিষ্যতের জন্য অজিত বাবুর এ সন্দেহ হইল কেন? উক্ত কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ রাধিকার "নব নব রূপান্তর" ঘটাইতে একবার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার ফলে যে ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও ভানুসিংহের পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছে, খাঁটি বৈষ্ণব-কবিতার তুলনায় উহার মূল্য কি, তাহা সাহিত্য-সেবিমাত্রেই অবগত আছেন। অজিত বাবু সে প্রসঙ্গ না তুলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন; নতুবা কি জন্য যে নব্য বাংলার দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি উক্ত কাব্য গ্রন্থে খাঁটি বৈষ্ণব-কবিতার অনুপম আন্তরিকতা ও কাব্য-সৌন্দর্য্যের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই—সেই কথা বুঝিতে যাইলে বৈষ্ণব কবিতার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইত! কেহ মনে করিবেন না যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতি-কবিতার সহিত বৈষ্ণব-কবিতার যে চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি! আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে বৈষ্ণব-কবিতার অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু সমাজ ও শিক্ষা-দীক্ষার পার্থক্যে সেই অনুকরণ কাব্য-হিসাবে সফল হয় নাই—হইবেও না। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুকরণ করিতে চাহেন নাই—কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণব-কবির কাব্য তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যেও অনির্ব্বচনীয়ভাবে রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেখানে বৈষ্ণব-কবিতার সাদৃশ্য বস্তুতই বিস্ময়জনক। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সহৃদয়তা ও কবিত্বের উৎকর্ষই প্রমাণিত হইতেছে। আমরা অজিত বাবুর আলোচনাটিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিলাম,—সকল কথা যে সকলের মনঃপূত হইবে, এমন আশা করি না।

কেননা, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এই কথাটি কবিতার বিচারে যেমন প্রযোজ্য—তেমন অন্যত্র নহে। তথাপি রস ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত এমন কতকগুলি সূত্র আছে—যাহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক করা চলে না। অজিত বাবু নব্য কবিতার (Romantic poetry) একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া প্রাচীন কবিতার (classical poetry) সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,—পারিলে বৈষ্ণব-কবির অতুলনীয় কাব্যের সম্বন্ধে তিনি এরূপ একদেশদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন না। অজিত বাবুর সমালোচনায় এরূপ আরও অনেক কথা আছে—যাহার যথার্থতা স্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমরা সেই সকল অবান্তরকথার আলোচনা করিয়া আর কথা বাড়াইতে চাহি না। ইহা সত্য যে, এখন কেহ শত চেষ্টা করিয়াও প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির ন্যায় কবিতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না,—সেরূপ চেষ্টা করারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদিগকে ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা বাংলা সমাজ ও সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝি—উহার প্রাণে আজ পর্য্যন্তও নব সভ্যতার আত্ম-প্রতিষ্ঠা (individualism) অপেক্ষা আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতার আত্ম-ত্যাগের ভাবই জাগিয়া আছে,—সুতরাং যাঁহারা প্রতীচ্য নব সভ্যতার মোহে আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ সাধন প্রেমানুভূতি ও প্রেমতন্ময়তাকে বর্জ্জন করিয়া—উহার পরিবর্ত্তে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মখ্যাপনকে বরণ করিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদিগের সমাজ-সংস্কার বা সাহিত্যসৃষ্টি যে বাংলার প্রাণকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করিতে পারে নাই—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যদি বাংলার সমাজ ও সাহিত্য কোন সময়ে উহার সেই প্রাচীন শিক্ষা ও দীক্ষা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে উহাকে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে ঘোরতর দুর্দ্দিন মনে করিব। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের এই প্রাণের ভাবগুলি বুঝিয়া, আমরা যাহাতে চিরকাল সেগুলিকে সমাদর করিতে পারি—ও সেগুলিকে জীবনের ধ্রুবতারা ভাবিয়া সময়োপযোগী সমাজসংস্কার ও সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারি, প্রত্যেক সামাজিক ও সাহিত্যসেবীরই উহা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। যে প্রতীচ্য মনীষীরা তাঁহাদিগের অসাধারণ চেষ্টা, পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তার গুণে জগতের সর্ব্ববিধ সমাজ ও সাহিত্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিয়া সমুন্নত সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য-সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহাদিগের নিকট এতদিন শিক্ষা লাভ করিয়া যদি আজ পর্য্যন্তও আমাদিগের বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের রত্নগুলি বাছিয়া লইবার শক্তি আমরা লাভ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের উচ্চশিক্ষার অভিমান যে অত্যন্ত অসার—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্‌, এ।

বিন্দীর সাঙ্গা

(১)

ছুলের মেয়ে বিন্দী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বছরখানেক পরে যখন ঘোষপুরের রামু ঘোড়ুইকে সাঙ্গা করিল, তখন সে একবারও ভাবে নাই যে, তাহাকে শেষে মাছ ধরিয়া, মাছ বেচিয়া দিন চালাইতে হইবে। বাপ বেচু মাহার জাতিতে ছুলে হইলেও মাছ ধরা তাহার ব্যবসায় ছিল না। তাহার চাষবাস ছিল, ঘরে সংবৎসরের খোরাকী ধান মরাই বাঁধা থাকিত। তা ছাড়া পাল্কীর সর্দ্দারীও ছিল, সুতরাং পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতকে উপেক্ষা করিয়া, পুকুরের জলে নামিয়া বিন্দীকে কখনও মাছ ধরিতে হয় নাই। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে, শ্রাবণের অবিরল বারিধারার মধ্যে হাটে বাজারে বা পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচিবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না। বিবাহও হইয়াছিল সমান ঘরে; সেখানেও বিন্দীকে ভাত-কাপড়ের জন্য কখনও ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু বাপ-খুড়ার অমতে সাঙ্গা করিয়া, নূতন স্বামীর ঘরে আসিয়া যখন তাহাকে এ সকলই করিতে হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, গুরুজনের কথা না শুনিয়া কাজটা ভাল করে নাই।

জাতীয় সমাজে সাঙ্গা প্রচলিত থাকিলেও বাপের ইচ্ছা ছিল না যে, মেয়ের সাঙ্গা দেয়। মায়েরও তেমন মত ছিল না। বিন্দী কিন্তু বারুণীর মেলা দেখিতে গিয়া রামুর মুখের মিষ্ট কথায় যে একটা ভালবাসার স্বপ্ন লইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল, সে স্বপ্নের ঘোরটা সে কিছুতেই কাটাইতে পারিল না। সুতরাং মা-বাপের অমতেও সে রামুকে সাঙ্গা করিতে উদ্যত হইল। কন্যার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া বেচু বলিল, "যদি সাঙ্গা কত্তেই হয়, তবে গাংপুরের নিমু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা কর্। রেমো ছোঁড়ার চাল নাই, চুলো নাই, ওকে সাঙ্গা ক'রে শেষে কি এক মুঠো ভাতের তরে কেঁদে বেড়াবি?"

বিন্দীর মনে কিন্তু তখন ভাত-কাপড়ের ভাবনাটা একবারও আসিল না। সে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রামু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা করিল। বাপ প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর মেয়ের মুখ দেখিবে না। বিন্দীও আর বাপকে মুখ দেখাইল না, রামুর হাত ধরিয়া তাহার ঘর করিতে আসিল। রামুর কুঁড়ে-ঘর, তালপাতার ছাউনী; দরজায় কবাট নাই, ছেঁচা বাঁশের আগড়। বিন্দী সেই আগড় দেওয়া, তালপাতায় ছাওয়া কুঁড়েটিকেই স্বর্গ বলিয়া মানিয়া লইল।

কিন্তু দিন কতক পরে বিন্দীকে যখন ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া, জাল ঘাড়ে পুকুরে পুকুরে ঘুরিতে হইল এবং মাছ বেচার পয়সায় চাল কিনিয়া আনিয়া দিন চালাইতে হইল, সেই দিন তাহার সাধের স্বর্গটা সহসা যেন কঠোর মর্ত্ত্যে পরিণত হইয়া আসিল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিন্দী সেই ভাঙ্গা কুঁড়েটুকুর মধ্যে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। স্বর্গই হউক বা মর্ত্ত্যই হউক, সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েটুকুকেই আপনার সুখের কেন্দ্র করিয়া লইয়া বিন্দী দিন কাটাইতে লাগিল।

তা রামুও যে অক্ষম ছিল, পয়সা উপায় করিতে পারিত না, এমন নয়। সে পাল্কী বহিত, পাল্কীর ভাড়া না জুটিলে মজুর খাটিত। কিন্তু তাহার উপার্জ্জনের একটি পয়সাও ঘরে আসিত না। যে দিন যাহা পাইত, তাহা বাজারের সিদ্ধেশ্বর শাহার মদের দোকানে, অথবা করিমদ্দি চাচার তাড়ির আড্‌ডায় দিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ফরিত। ঘরে আসিয়া বিন্দীকে গালাগালি দিত, তাহার মা-বাপের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিত। বিন্দী কোন দিন মুখ বুজিয়া থাকিত, কোন দিন গালাগালির উত্তরে দুই একটা গালাগালি দিত। যে দিন উত্তর করিত, সে দিন বিন্দী স্বামীর নিকট দুই চারি ঘা মার খাইত। মার খাইয়া বিন্দী কাঁদিতে বসিত, আর রামু টলিতে টলিতে গিয়া দাবার উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া পড়িত।

তার পর বমিতে যখন চাটাই ভাসিতে থাকিত, সংজ্ঞাহীন রামুর মুখের ভিতর মাছি ঢুকিত, তখন বিন্দী আসিয়া সে সকল পরিষ্কার করিয়া দিত, ঘটী করিয়া জল আনিয়া রামুর চোখে মুখে মাথায় দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে বসিত। নেশা ছুটিয়া গেলে রামু উঠিয়া বসিত। বিন্দী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া ভাতের কাছে বসাইয়া দিত। রামু আহার শেষ করিয়া উঠিলে বিন্দী তাহাকে আঁচাইবার জল দিয়া তামাক সাজিয়া আনিত। রামু দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিত—

"সে কি আমার অযতোনের ধোন।
মনো প্রাণো যারি করে করি সমোপ্পোণ।
সে কি আমার—"

বিন্দী ভাতের গ্রাস মুখের কাছে রাখিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, রামু গাহিতেছে—

"তবে যে অপ্রিয়ো বোলি, যখনো জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকোলিই, প্রেমেরি কারোণ।
সে কি আমার—"

একটা অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিন্দীর সকল নির্য্যাতন—সকল কষ্ট মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইত।

আধ ক্রোশ দূরে বাপের বাড়ী। সুতরাং বিন্দীর কষ্টের কথা মা-বাপের অগোচর ছিল না। বাপ রাগিয়া বলিত, "চুলোয় যাক্ বিন্দী।" মা কিন্তু রাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে সময়ে সময়ে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইত, এবং মেয়ের কষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে থাকিত। বলিত, "আমার ভাত কে খায় বিন্দি, আর তুই এক মুঠো ভাতের তরে হা হা ক'রে বেড়াস্?"

বিন্দী উত্তর করিত, "কি করবো মা, কপাল।"

মা আক্ষেপ করিয়া বলিত, "তোর কপাল নয় বিন্দি, আমারই পোড়া কপাল। থাক্ তুই আমার ঘরে; পেটে ঠাঁই দিয়েছি, হাঁড়ীতে কি ঠাঁই দিতে পারবো না?"

মুখ নীচু করিয়া বিন্দী বলিত, "তোমার জামাই যে রাগ করবে মা?"

মা রাগিয়া বলিত, "আরে মোর জামাই! বলে—'ভাত কাপড়ের কেউ-নয়, নাক কাট্‌বার গোঁসাই।' মুখে আগুন অমন জামাইয়ের।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিত, "ছিঃ মা!"

মা হাত-মুখ নাড়িয়া উত্তর করিত, "আ লো, এত দরদ! তবু যদি দু'বেলা উত্তম-মধ্যম না দিত।"

বিন্দী ধীরে ধীরে বলিত, "তা মারলেই বা মা, আপনার মানুষ বটে তো।"

মা গর্জ্জন করিয়া বলিত, "ঝ্যাঙরা মারি অমন আপনার মানুষের মুখে; মার-ধর কত্তে তো আছে, কিন্তু এই হাড়ভাঙ্গা শীতে তোকে জলে নেমে যে মাছ ধরতে হয়, তার কি?"

মৃদু হাসিয়া বিন্দী উত্তর করিত, "তা ধরলেই বা মাছ, দুলের মেয়ে তো বটি।"

মা রাগে মেয়েকে কতকগুলো তিরস্কার করিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু মায়ের প্রাণ, থাকিতে পারিত না। মাঝে মাঝে দু'সের চাল, এক সের মুড়ি, দু'পোয়া মুসুর কলায়, ক্ষেতের পাঁচটা বেগুন, বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া মেয়েকে দিয়া আসিত।

(২)

"বিন্দি!"

"কেনে?"

"হাঁড়ী তুল্‌ছিস্ যে?"

স্বামীকে ভাত দিয়া বিন্দী হাঁড়ী তুলিতেছিল। উনানের পাশে বেদীর উপর হাঁড়ীটা রাখিয়া তাহার মুখে সরা চাপা দিতে দিতে বিন্দী বলিল, "হাঁড়ী তুলবো না তো প'ড়ে থাকবে?"

রামু ভাতে নুন মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুই খাবি না?"

বিন্দী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না।"

রা। কেনে?

বি। খিদে নেই।

রা। খিদে নেই, না ভাত নেই?

বি। রাঁধ্‌লে তো ভাত থাক্‌বে?

রা। চাল থাক্‌লে তো রাঁধ্‌বি?

বিন্দী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তোকে বলেছে চাল নেই, চাল থাক্‌ না থাক্‌, রাঁধি না রাঁধি, সে আমার খুসী। তোর মরদ মানুষের এত খোঁজে দরকার কি রে?"

ঈষৎ হাসিয়া রামু বলিল, "দূর মাগী, আমি তোর খোঁজ-খবর নেব না তো নেবে কে?'

বিন্দী মুখ ফিরাইয়া ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে উত্তর করিল, "যম।"

রামু নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত উদরস্থ করিয়া বলিল, "তোর গোসা হয়েছে বিন্দি?"

বিন্দী একটু রাগতভাবে বলিল, "হাঁ, তোকে বলেচে গোসা হয়েচে।"

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রামু দৃঢ়স্বরে বলিল, "আলবোৎ গোসা হয়েচে। কৈ, তুই আমার মাথার কিরে ক'রে বল্‌ দেখি?"

বিন্দী ভ্রূকুটী করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ্‌ মিন্‌ষে, খেতে বসেছিস্‌, খেয়ে উঠে যা।"

রামু মুখ নীচু করিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "আমি তো খেতে বসেছি, খেয়ে উঠ্‌বো, কিন্তু তুই না খেয়ে থাক্‌বি বিন্দি?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বিন্দী বলিল, "ভাল রে মিন্‌ষে, এই যে আমার ওপর দরদ দেখাতে শিখেচিস্‌?"

রামু গম্ভীরস্বরে বলিল, "কেনে বিন্দি, আমি কি তোকে দরদ করি না?"

শ্লেষের তীব্রস্বরে বিন্দী বলিল, "খুব করিস্‌। এই দুকুর বেলা কত দরদ দেখালি? চোখের কোলটা এখনো ফুলে আছে।"

লজ্জিতকণ্ঠে রামু বলিল, "বড্ড লেগেচে, না বিন্দি?"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, "না, লাগ্‌লে কি লাগে?"

রামু নতমস্তকে কোলের ভাতগুলাকে চটকাইতে লাগিল। বিন্দী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "লাগেনি তেমন, তবে আর একটু হ'লেই চোখটা যেতো। তা যেতো যেতোই, তুই ব'সে রইলি যে? খেয়ে নে।"

রামু ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া, বাঁ হাতে ধরিয়া ঘটীর জলটা গলায় ঢালিয়া দিল। বিন্দী বলিল, "ও কি, ভাত ফেলে উঠ্‌ছিস্ যে ?"

রামু বলিল, "ফেলে উঠ্‌ছি না, খেয়েই উঠ্‌ছি।"

বি। তবে ওগুলা প'ড়ে রইলো কেনে ?

রামু। থাক্, তুই খাবি।

রামু উঠিতে গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল; ব্যগ্রস্বরে বলিল, "আমার মাথা খাস্, খেয়ে ফেল্, কা'ল আবার তোকে ভাড়া বইতে যেতে হবে।"

রামু বলিল, "আর তুই উপোস থাক্‌বি ?"

বিন্দী বলিল, "আমার খিদে নেই, মাইরি বল্‌ছি, আমার খিদে নেই।"

রামু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আমাকে ছুঁয়ে বল্‌চিস্ ?"

বিন্দী তাহার হাতটা ছুঁড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খেতে হয় খা, নয় তো চুলোয় যা। আমি কেনে কথায় কথায় তোর কিরে কত্তে যাব রে মিন্‌ষে ?"

রামু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। বিন্দী তাহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া খাইতে বসিল। রামু তামাক টানিতে টানিতে ডাকিল, "বিন্দি!"

বিন্দী মুখের ভাত চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কি ঘরে চাল ছিল না ?"

বিন্দী মুখের ভাতগুলা গিলিতে গিলিতে উত্তর করিল, "আধসেরটাক প'ড়ে আছে।"

রামু বলিল, "তবে রাঁধ্‌লি না কেন ?"

বিন্দী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "আজ রাঁধ্‌লে কা'ল কি খাবি!"

রামু রাগিয়া বলিল, "ছাই খাব। কা'ল খাব ব'লে আজ তুই উপাস দিবি ?"

দুঃখিত স্বরে বিন্দী বলিল, "কাজেই, কা'ল আর মাছ ধর্‌তে যেতে পারবো না। কোমরে একটা দরদ লেগেছে।"

রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকা হাতে বসিয়া রহিল।

বিন্দী আহার শেষ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছিস্ ঘোড়ুই ?"

রামু মাথা না তুলিয়াই বলিল, "ভাব্‌চি, মদ ছাড়্‌বো, না তোকে ছাড়্‌বো ?"

বিন্দী বলিল, "মদ কি ছাড়্‌তে পার্‌বি ? ছাড়িস্ তো আমাকেই ছাড়্‌বি।"

রামু মুখ তুলিল; অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তোকে ছাড়্‌বো বিন্দি ?"

বিন্দী ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া রামুকে শুইবার জন্য ডাকিল। রামু কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুই তিনবার ডাকিয়া স্বামীর সাড়া না পাইয়া বিন্দী বাহিরে আসিল, এবং বাঁহাতে কেরোসিনের ডিবা, ডান হাতে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "তা আমাকে ছাড়িস্ ছাড়্‌বি, এখন শুবি আয়। কা'ল সকালে উঠেই আবার তোকে ভাড়ায় যেতে হবে।"

রামু উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

(৩)

"তোর পায়ে পড়ি ভুতো, আজ আর খাব না।"

ভুতো ওরফে ভূতনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেনে বল্ দেখি, আজ তুই তপিস্বি হয়েছিস্ না কি?"

রামু বলিল, "না, আমি দিলেসা করেছি।"

ভুতো বলিল, "বিন্দীর কাছে বুঝি?"

ভুতো শ্লেষের হাসি হাসিল। রামু বলিল, "আমি নিজের মনে মনে দিলেসা করেছি, ও সব আর ছোঁব না।"

ভু। বিন্দী বুঝি বারণ করেছে!

রা। বারণ কর্‌বার মেয়ে বিন্দী নয়।

ভু। তবে?

রা। তবে আবার কি? সে পেটে না খেয়ে আমাকে খাওয়াবে আর আমি নেশা ক'রে সব উড়িয়ে দেব!

তিরস্কারের পরে ভুতো বলিল, "এই বে, শালা মরেচে, ওরে মুখ্যু, এই যে তিন তিন কোশ পাল্কী ঘাড়ে ঘুরে এলি, এক পাত্তর পেটে না দিলে গা-গতরের বেদনা যাবে কেন? বৌ আগে, না নিজের জানটা আগে? বলে—আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম?"

রামু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভুতো তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "বেশী না হয়, দুপাত্তর টেনে যাবি আয়, পয়সা তোকে দিতে হবে না।"

রামু সঙ্গীর কথা ঠেলিতে পারিল না, তাহার সহিত গিয়া সিদ্ধেশ্বর শাহার দোকানে ঢুকিল। সেখানে দুই পাত্রের স্থলে চারি পাত্র উজাড় হইয়া গেল; তথাপি রামু উঠিল না। শুধু একবার বলিল, "ঘরে আজ চাল নাই ভুতো, মাগীটার খাওয়া হবে না।"

ভুতো আর একপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল, "তোকে বলেছে খাওয়া হবে না। তুই দেখছি, বিন্দীর ভাবনা ভেবে ভেবেই মারা যাবি। তুই যদি কা'ল ম'রে যাস্?"

ভীত কম্পিত-কণ্ঠে রামু বলিল, "না ভূতো, তা হ'লে মাগী আছাড়ি-বিছাড়ি ক'রে ম'রে যাবে।"

ভূতো হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ম'রে যাবে না চেয়ে থাকবে। তুই দেখিস্, তিন দিন না যেতে যেতে আবার একটা সাঙ্গা ক'রে বস্‌বে।"

রামু পাত্রটা গলায় ঢালিয়া দিয়া সক্রোধে বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কইবি ভূতো; বিন্দী তেমন নয়।"

ভূতো ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "রেখে দে তোর বিন্দী, অমন কত ইন্দির চন্দর দেখা গেছে। নফরা মাজির বৌটা কি করলে দেখলি না! তোর ছাঁচার ধারে পেলা কাহারের বৌটা বার বার চার বার—"

ভূতো নিজের জন্য একপাত্র ঢালিতে যাইতেছিল। রামু তাহার হাত হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইয়া এক নিশ্বাসে সবটা গলায় ঢালিয়া দিল; তার পর বোতলটা মেঝেয় আছড়াইয়া দিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "লেয়াও দোসরা বোতল।"

ভূতো বলিল, "আমার ট্যাঁক খালি।"

রামু আপনার কোঁচার খুঁট হইতে টাকাটা খুলিয়া ছুড়িয়া দিল।

(৪)

সন্ধ্যা হয় হয়, বিন্দী উনানে ঘুঁটে দিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল আর রামুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় রামু টলিতে টলিতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল; উচ্চ স্খলিত-কণ্ঠে ডাকিল, "বিন্দি!"

বিন্দী ডালের হাঁড়ীটা উনানে বসাইয়া বাঁশের চোঙ্গা দিয়া উনানে ফুঁ দিতেছিল, চোঙ্গাটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "এসেছিস্?"

রামু বলিল, "আলবোৎ আস্‌বো। তোর বাবার ঘর যে আস্‌বো না?"

বিন্দী থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কথা শোন একবার, আজ আবার খেয়ে মরেছিস্!"

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ রাও, তোর বাবার খাই!"

রামু কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার পা দুইটা এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। বিন্দী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তা খেয়েছিস্ খেয়েছিস্, এখন শুয়ে পড়্‌বি আয়!

রামু হাতটা টানিতে টানিতে বলিল, "তোর বাবার হুকুমে শোব?"

বিন্দীর পিতার উদ্দেশ্যে রামু একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিল। বিন্দী তাহার হাতটা ছুড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল, "তবে এইখানে প'ড়ে মর্।"

বিন্দী চলিয়া যাইতেছিল, রামু তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "আমি মর্‌বো! আমি ম'লে তুই কাকে সাঙ্গা কর্‌বি?"

বিন্দী রাগিয়া উত্তর করিল, "যমকে।"

রামু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কর্‌বি?"

বিন্দীও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "কর্‌বো না ত কি তোকে ভয় ক'রে থাক্‌বো?"

রামু বিন্দীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লাথি মারিতে গেল; কিন্তু পাটা বিন্দীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না, তৎপূর্ব্বে রামু নিজেই উঠানের উপর দুম করিয়া পড়িয়া গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিল। রামু উঠিয়া টলিতে টলিতে বিন্দীকে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিল। বিন্দী বলিল, "আচ্ছা, কা'ল সকালে যাব।"

রামু বলিল, "না, এখুনি যেতে হবে।"

বিন্দী বলিল, "আমি যাব না।"

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, "তোর বাবাকে যেতে হবে। তুই যদি না যাস্—"

রামু একটা ভয়ানক কটু কথা বলিল। উত্তরে বিন্দী তাহাকে গালাগালি করিল। রামু তথন বিন্দীর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। বিন্দীর চীৎকারে পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকে ছুটিয়া আসিল। ভূতো বহু কষ্টে রামুকে টানিয়া আনিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে শোয়াইয়া দিল। বিন্দী প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিল; সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল এবং মুখে হাতে জল দিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিল।

বিন্দীর ছয় মাসের গর্ভ ছিল। সেই রাত্রিতে তাহার গর্ভস্রাব হইয়া গেল। সে ঘরে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভূতো চার পয়সার কুইনাইন কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল।

রামুর নেশার ঘোরটা যখন একটু কাটিয়া আসিল, তখন সে বিন্দীর যন্ত্রণা-সূচক কাতর স্বর শুনিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কেমন, আর সাঙ্গা কর্‌বি?"

বিন্দী কাতরস্বরে বলিল, "ওরে—একটু জল—একটু জল।"

গর্জ্জন করিয়া রামু বলিল, "কভি নেহি, যাকে সাঙ্গা কর্‌বি, সেই জল দেবে।"

বিন্দী বলিল, "না ঘোড়ুই, আর সাঙ্গা কর্‌বো না, তোর পায়ে পড়ি, একটু জল দে।"

রামু উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; মাথাটা তুলিতেই তাহা ঘুরিয়া চাটায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ভূতো ঘরে যায় নাই, কাপড় মুড়ি দিয়া রোয়াকের এক পাশে পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া জল লইয়া বিন্দীর মুখের কাছে ধরিল; বলিল, "জল খা বিন্দি।"

চমকিত হইয়া বিন্দী বলিল, "তুই?"

ভূতো বলিল, "হাঁ আমি, জল খা।"

ভূতো মুখে জল ঢালিয়া দিল। বিন্দী জল খাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিন্দী ভূতোকে শত্রু বলিয়াই মনে করিত। ভূতো যে বাস্তবিক তাহার সহিত শত্রুতা আচরণ করিত, তাহা নহে, বরং সে বিন্দীর অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। তাহার এই চেষ্টাটুকুই কিন্তু বিন্দীর নিকট শত্রুতা বলিয়া বোধ হইত।

বিন্দী মাছ ধরিতে যাইত, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় বেশী মাছ ধরিতে পারিত না। ভূতোও মাছ ধরিত, সে বিন্দীর অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিত, এবং কিরূপে জাল টানিতে বা তুলিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিত। বিন্দী কিন্তু উাহার এ উপদেশ গ্রহণ করিত না, সে যাহা করিতে বলিত, বিন্দী তাহার বিপরীত আচরণ করিত। ইহার ফলে তিন চারি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর বিন্দী যখন দুই গণ্ডা পয়সার মাছও ধরিতে পারিত না, তখন ভূতো নিজের হাঁড়ী হইতে এক অাঁজলা মাছ লইয়া বিন্দীর হাঁড়ীতে ঢালিয়া দিতে যাইত। বিন্দী তাহার এই দান লইতে চাহিত না। এক এক দিন সে হাঁড়ী হইতে ভূতোর মাছ-ভরা অাঁজলাটা ঠেলিয়া দিয়া রাগে গর-গর করিয়া চলিয়া যাইত। ভূতো হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; তাহার হাতের মাছগুলা ঝর্ঝর্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত।

আজি সেই ভূতোকে নিজের রোগশয্যার পাশে দেখিয়া বিন্দী শুধু চমকিত হইল না, বিরক্তও হইল। ভূতো বিন্দীকে জল খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছিস্ বিন্দি?"

বিন্দী রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "তুই এখানে কেন? ঘরে যাস্নি যে?"

ভূতো বলিল, "তোকে এমনতর দে'খে কি ঘরে যেতে পারি? তোকে দেখবে কে?"

বিন্দী রাগিয়া বলিল, "যম। কেন, তুই ছাড়া কি আর দেখবার লোক নাই?"

সহাস্যে ভূতো বলিল, "যে দেখবার, সে তো মেরে ধ'রে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে আছে। তুই একটু জল চাইলে কি জবাব দিলে, তা শুন্লি তো?"

বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিল, "খুব শুনেছি। তুই এখন যাবি কি না বল্?"

"যাচ্ছি" বলিয়া ভূতো বাহিরে আসিয়া দরজার আগড়টা ভেজাইয়া দিল।

সকালে ভূতোর মুখে সংবাদ পাইয়া, বিন্দীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে বাপও আসিল। তাহারা আসিয়া রামুকে কতকগুলা গলাগালি দিল। তার পর ভূতোর পরামর্শমতে বিন্দীকে ডুলিতে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। রামু রোয়াকের এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুর-খাশুড়ীর কথার একটিও উত্তর দিল না।

অনেকটা বেলা হইলে রামু উঠিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসিল। তার পর রান্না করিতে গিয়া দেখিল, উনানের উপর ডালের হাঁড়ীটা বসান রহিয়াছে। পাশে সরায় কাঁচা মসুর ডাল। রামু মসুর ডাল ভালবাসিত, এ জন্য বিন্দী মাছ বেচিয়া যে দিন দুই পয়সা বেশী পাইত, সে দিন সে মসুর ডাল কিনিয়া আনিত। মাছের চুপড়ীর ঢাকা খুলিয়া রামু দেখিল, তাহাতে বড় বড় চারিটা চিংড়ী-মাছ নুন-হলুদ মাখা অবস্থায় পড়িয়া আছে। চিংড়ী-মাছ রামুর বড় প্রিয়, এ জন্য বিন্দী চিংড়ী-মাছ পাইলে প্রাণান্তেও তাহা বেচিত না, ঘরে আনিয়া স্বামীকে ঝোল রাঁধিয়া দিত। মাছের চুপড়ীর পাশেই কর্ত্তিত আলু-বেগুন রহিয়াছে। রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সাম্‌নের কুলুঙ্গীতে একমুটা চিঁড়া-মুড়কী, আর একখানা তিলে পাটালী ছিল। ইহা যে রামুর জলযোগের জন্যই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে রামুর বিলম্ব হইল না। রামু আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সাম্‌নের দেওয়ালের কুলুঙ্গীর উপর একটা শূন্য মদের বোতল ছিল। রামু সেটাকে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বোতলটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রামু ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া বিন্দীর পরিত্যক্ত বিছানার উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(৫)

বিন্দী চলিয়া যাইবার পর তিন চার দিন কাটিয়া গেল। রামুর এই দিন কয়টা বড় কষ্টেই কাটিল। এখনও সে মদ খাইত, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাইত। মদ খাইয়া টলিতে টলিতে আসিয়া, দাবার উপর শুইয়া পড়িত। রাত্রিটা যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা সে জানিতে পারিত না। যখন নেশার ঘোর কাটিত, জ্ঞান হইত, তখন চোখ মেলিয়া দেখিত, সকালের রোদ আসিয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, আর সে ধূলা ও শুষ্ক বমির উপর গড়াগড়ি দিতেছে। তখন রামুর বিন্দীকে মনে পড়িত, তাহার সেবা মনে পড়িত, অনুতাপে—আত্মগ্লানিতে তাহার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইত। এদিকে উপবাসে শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিত, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে থাকিত। রামু ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইয়া, খানিকটা জল ঢক্‌ঢক্ করিয়া গলায় ঢালিয়া দিত।

একদিন রামু জল খাইতে গিয়া দেখিল, কলসী শুষ্ক, কা'ল জল তুলিতে ভুল হই য়াছে। সে রাগে কলসীটা লইয়া আছাড় দিল। মাটীর কলসী শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। ভাঙ্গিবার সময় কলসীটা ঝন্ঝন্ শব্দে যেন একটা বিকট হাসি হাসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত রামুকে কঠোর উপহাস করিতে লাগিল। রামু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া চূর্ণ খণ্ডগুলাকে কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

দুই দিন অনাহারের পর রামু রাঁধিতে গেল। কিন্তু রাঁধিবার উপকরণ কোথায় কি আছে, তাহা সে জানিত না। বহু কষ্টে ভাতে ভাত রাঁধিবার মত যোগাড় করিয়া লইয়া সে উনানে হাঁড়ী চাপাইল। কিন্তু উনান জ্বালিবার কিছু পাইল না। বিন্দী এখান সেখান হইতে ঘুঁটে কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাঁধিত। রামু বহু কষ্টে কয়েকখান ঘুঁটে আর আগশুক্‌না গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া উনান জ্বালিতে গেল, উনান কিন্তু জ্বলিল না। কেরোসীনের ডিবার তেল ফুরাইয়া গেল, ধোঁয়ায় রামুর চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল, তথাপি উনান জ্বলিল না। রামু রাগে একটা লাঠি আনিয়া হাঁড়ীর উপর বসাইয়া দিল। হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া জল চালে উনান ভরিয়া উঠিল। রামু আপন মনে গর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে গিয়া চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়া 'বিন্দী বিন্দী' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় বাজার হইতে দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া, রামু পিত্তরক্ষা করিল।

সেই দিন রাত্রে রামু স্বপ্নে দেখিল, যেন বিন্দী আসিয়া তাহার মাথার শিয়রে বসিয়াছে, এবং আস্তে আস্তে তাহার মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকি-তেছে, "ওঠ্ না ঘোড়্ ই, দু'দিন তোর খাওয়া হয় নি, খাবি আয়।"

রামু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিন্দি, বিন্দি!"

শূন্য গৃহে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি হাসিয়া উত্তর দিল,—"হি হি হি হি!" রামু অবসন্নভাবে আবার শুইয়া পড়িল।

স্বপ্নে বিন্দীকে দেখিয়া রামুর মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সে আর ঘুমাইতে পারিল না, পড়িয়া পড়িয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। দরজার আগড়ের ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিলে রামু উঠিয়া মুখ হাত ধুইল, এবং গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া, খেটে লাঠিটা লইয়া বিন্দীকে দেখিতে চলিল।

পিছন হইতে ভুতো ডাকিয়া বলিল, "এত সকালে কোথায় চলেছিস্ রে?"

পাছু ডাকায় বিরক্ত হইয়া রামু উত্তর দিল, "যাচ্চি।"

ভুতো বলিল, "কোথায় যাচ্চিস্? শ্বশুরবাড়ী নাকি?"

অপ্রসন্নভাবে রামু উত্তর করিল, "বিন্দীকে দেখতে।"

ভূতো বলিল, "আর দেখতে গিয়ে কি হবে, ফিরে আয়।"

অমঙ্গলাশঙ্কায় রামুর বুকটা দুড় দুড় করিয়া উঠিল। সে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ভূতোর মুখের দিকে চাহিল। ভূতো বলিল, "বিন্দী যে তোর নামে নালিশ করেছে।"

বিস্ময়াপ্লুতস্বরে রামু বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা!"

ভূতো তখন মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি তো তোকে তখনই ব'লেছিলাম, ও সব সাঙ্গালী মাগীকে বিশ্বাস নাই, ওরা সব কত্তে পারে।"

ভূতো চলিয়া গেল। রামু ফিরিয়া লাঠি গামছা ফেলিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে রামু যখন রন্ধনের উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিল, তখন বিন্দীর ভাই পেয়াদা সঙ্গে আনিয়া রামুকে শমন ধরাইয়া গেল।

(৬)

রামু গিয়া শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরিল, পাড়ার পাঁচজনের কাছে গিয়া পড়িল। কিন্তু বেচারাম কাহারও কথা রাখিল না; সে বলিল, "আমার মরায়ে তিন আড়া ধান আছে, এই ধান বেচে বেটাকে জেলে দেব, তবে আমার নাম বেচারাম।"

গ্রামের করালী চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমার পরামর্শদাতা ও তদ্বিরকারক হইয়াছিলেন। রামু গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাও কি হয় বাপু! আমার কথায় নির্ভর ক'রেই বেচাবী মোকদ্দমায় হাত দিয়েছে, আমি কি কথার নড়চড় কত্তে পারি? এতে যে আমার অধর্ম্ম হবে।"

রামু কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না, কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শনে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাণটা একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, "তা কি জান বাপু, পেটে খেলেই পিঠে সয়! গোটা দশেক টাকা দিতে পার তো চেষ্টা দেখি। পরশু মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে। এ তো আর তোমাদের ঘরের মেয়ে পাঠানো নয়, বিস্তর খরচ, বুঝ্‌লে?"

রামু ইহা বুঝিল বটে, কিন্তু দশটা টাকা যে কোথায় পাইবে, তাহাই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু যেরূপে হউক, টাকাটা সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা জেলে যাইতে হয়। রামুর মনে পড়িল, বিন্দীর হাতে আটগাছা রূপার চুড়ী আছে, তাহা বেচিলে দশ টাকা হইতে পারে। বিন্দী কি চুড়ী দিয়া তাহাকে জেল হইতে রক্ষা করিবে না।

রামু তক্কে তক্কে থাকিয়া বিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্যস্তভাবে বলিল, "বিন্দি, তোর চুড়ী ক গাছা দে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিন্দী বলিল, "কেনে রে?"

রামু বলিল, "করালী ঠাকুরকে দিতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, "ঘুষ নাকি ?"

রামু বলিল, "নয় তো আমাকে জেলে যেতে হবে।"

বিন্দী বলিল, "তুই জেলে যাবি, তা আমি চুড়ী দিতে গেলাম কেন ?"

রা। তুই যে আমার ইস্তিরী।

বি। মার্‌বার সময় সে কথাটা মনে থাকে না ?

লজ্জিতভাবে রামু বলিল, "আর তোকে মার্‌বো না বিন্দি।"

বিন্দী বলিল, "আমি তোর ঘরে গেলে তো মার্‌বি ?"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি না ?"

মাথা নাড়িয়া বিন্দী বলিল, "উঁহু।"

রা। তবে কি আবার সাঙ্গা কর্‌বি ?

বি। কর্‌বো।

রা। সত্যি ?

বি। সত্যি।

রামু প্রস্থানোদ্যত হইল। বিন্দী জিজ্ঞাসা করিল, "চল্‌লি যে? চুড়ী নিবি না ?"

মুখ ফিরাইয়া রামু বলিল, "আর দরকার নাই।"

রামু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিন্দী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ভূতো জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে রামু, মামলার কিছু চেষ্টা-বেষ্টা দেখ্‌লি না ?"

উদাসভাবে রামু উত্তর দিল, "কি আর দেখ্‌বো ?"

ভূ। তবে জেলে যাবি ?

রা। গেলুম বা।

ভূ। বলিস্ কি রে, জেল যে ?

রামু হাসিয়া বলিল, "যার পাছু চাইতে নাই, তার জেলই কি, আর ঘরই বা কি ?"

ভূতো একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি নাকি বিন্দী আবার সাঙ্গা কর্‌বে ?"

রামু বলিল, "আমিও তাই শুন্‌চি। তুই চেষ্টা দেখ্ না।"

ভূতো সে কথার কোন উত্তর দিল না।

মোকদ্দমার দিন রামু জনৈক প্রতিবেশীকে তাহার কুঁড়ে দেখিবার ভার দিয়া আদালতে হাজির হইল।

(৭)

আদালতে গিয়া রামু দেখিল, ভূতো ও পাড়ার আরও তুই এক জন বিন্দীর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। বিন্দীর বাপ উকীল দিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাছতলায় বসিয়া সাক্ষীদের তালিম দিতেছেন। বিন্দী মাথায় কাপড় দিয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রামুর উকীল দিবার ইচ্ছা ছিল না। সে একাই জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

অসহায়ের সহায় ভগবান্। একজন নূতন উকীল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামুর মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িলে রামু গিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। ফরিয়াদী বিন্দী দাসীর ডাক পড়িল। বিন্দী মাথায় ঘোমটা দিয়া আদালতের মধ্যে আসিল। রামুর উকীল তাহাকে জেরা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামু তুই হাতে কাঠগড়া চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বিন্দী যাহা বলিল, তাহাতে শুধু উকীল কেন, রামু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিন্দী বলিল, "হুজুর, আসামী আমার সোয়ামী। ও আমাকে বড্ড ভালবাসে। ও সে দিন বেশী মদ খেয়ে এসেছিল। আমি ধ'রে শোয়াতে যেতে ও টাল খেয়ে আমার উপর প'ড়ে যায়। তাতেই অমার গর্ভ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। ও কোন দিনই আমাকে একটি চড়া কথা বলে নি। আমার বাপের সঙ্গে ওর বনিবনাও নাই, তাতেই আমার বাপ পাঁচজনের মত্‌লবে নালিস রুজু করেছে।"

রামু কাঠগড়ার ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। বিন্দীর প্রত্যেক কথায় তাহার বুকের ভিতর যেন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, "ওগো, সব মিছে, সব মিছে কথা। আমিই বিন্দীকে মেরে তার সর্ব্বনাশ করেছি।"

হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। রামু উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "হুজুর!"

পাহারাওয়ালা তাহাকে ধমক দিয়া কাঠগড়া হইতে বাহির করিয়া দিল। বিন্দী হাত ধরিয়া তাহাকে আদালতের বাহিরে আনিল।

বাহিরে আসিয়া রামু জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুই তোথায় যাবি বিন্দি?"

বিন্দী উত্তর করিল, "চুলোয়।"

রা। সাঙ্গা কর্‌বি না?

বি। কর্‌বো বই কি।

রা। কা'কে ?

রামুর মুখের উপর একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দী সহাস্যে বলিল, "আপাততঃ তোকে।"

বেচারাম হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ও ঠাকুর মশাই, এ কি হইলো ?"

চক্রবর্ত্তী সক্ষোভে বলিলেন, "আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু হইল। বিন্দী বেটী সব নাট ক'রে দিলে। বেটী ছোটলোকের মেয়ে কি না, ওর কি একটুও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান আছে ?"

ভূতো ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যা ব'লেছ ঠাকুর মশাই, ভদ্দর নোক না হ'লে কি ধম্ম-কম্ম বুঝ্‌তে পারে ?"

চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাক, বেটীকে এর ফল ভুগ্‌তেই হবে। এখন উকীলের সাড়ে সাত টাকা পাওনা আছে, সেটা মিটিয়ে দাও হে বেচারাম।"

বেচারাম মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিবার জন্য গেরো খুলিতে লাগিল। ভূতো শুনিতে পাইল, রামু তখন গলা ছাড়িয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"সে কি আমার অযতোনের ধো-ও-ন্,
সে কি আমার—"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পাগলের গীত

আমায় কেন কল্লে এমন সৃষ্টি ছাড়া
যাঁরা জপে যোগে বসেন ধ্যানে তাঁরা নিত্য পান ত সাড়া ?
আমায় টিপি-সাড়ে রূপ দেখিয়ে
রাতারাতি নগর ছাড়া।
আমি কোথায় কোথায় করে বেড়াই
পাগল হয়ে পাড়া পাড়া।
ওগে বড় বড় ভারী ওস্তাদ
ঝুড়ি ঝুড়ি জাড়ি-জাড়া,
তাঁরা ঘামিয়ে মাথা খুঁটে খুঁটে
বার করেছেন গাছ-গাছাড়া।
অকার উকার মকার যোগে
নাকি অমৃত রস তুমি খাড়া।
ব্যাখ্যার চোটে গগন ফাটে
খালি মাথা খারাপ কর্‌বার গোড়া।
দেখতে পেলে হোন না যিনি
আমি দাড়ি ধরে দিতাম নাড়া,
সত্যি সত্যি হয় কি তৃপ্তি—
নয় কি জপের বুলি পাখী পড়া ?
যদি মরা জপে রাম পেয়েছে
কাজ কি আমার শ্রুতি পড়া।
এই পেলুম পেলুম আর পেলুম না।
এইটি তোমার সবার বাড়া।
কেউ কি তোমার আছে মা, বাপ
যে নাম দেবে সেই হতোচ্ছাড়া
বল্‌তে গেলে যায় না বলা
ওগো, এমনি তুমি চিজ বেয়াড়া।

শ্রীশিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

গানের কথা

সেইবারকার পূজার ছুটীতে এলাহাবাদে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। হঠাৎ মধ্যপথে কোন দুর্ঘটনার জন্য গাড়ী থামিয়া গেল। শুনিলাম সে দিন আর গাড়ী চলিবে না। ষ্টেশন নিকটেই। সুতরাং ব্যাগটি হাতে লইয়া তদুদ্দেশে ছুটিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, ইতিপূর্ব্বেই তথায় অনেক যাত্রী সমাগত। বিছানা, বাক্স ও মালে ক্ষুদ্র স্থানটি একেবারে স্তূপাকার।

ষ্টেশন-মাষ্টারটি অতিশয় ভদ্রলোক। যাত্রীদের যাহাতে বিশেষ কোন কষ্ট না হয়, তিনি তাহা দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমাকে একটু ভদ্র যাত্রী দেখিয়া তিনি নিকটে আসিলেন। আমার আগমন ও গন্তব্যস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "এ দিকে আসুন।" পর্ব্বতপ্রমাণ জিনিষপত্রগুলি কোনক্রমে সরাইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। অপরিসর একখানি ঘর দেখাইয়া তিনি বিনয় সহকারে কহিলেন, "আজ রাত্রের মতন এইখানটাতেই বিশ্রাম করুন।"

আমি ত হাতে স্বর্গ পাইলাম। হিম জিনিষটাকে আমি ছেলেবয়স হইতেই অত্যন্ত ডরাই। সুতরাং ষ্টেশনে টিনের সেডের নীচে রাত্রি কাটাইতে হইবে না জানিয়া আমি যে বিলক্ষণ খুসী হইয়া গিয়াছিলাম, ইহা বলাই বাহুল্য। মাষ্টার মহাশয়কে বিধিমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কুলীদের নিকট হইতে খানকতক চট সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ব্যাগটি মাথায় দিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। লোকটি লজ্জিতভাবে বলিলেন, "মাপ করবেন, আপনাকে কি বিরক্ত করলাম ?"

যদিও তাঁহার প্রতি আমার মনের অবস্থা নিতান্ত প্রীতিকর ছিল না, তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম, "না, বিরক্ত হব কেন ?" ভাবিলাম, তিনিও বোধ হয় আমার মত বিপদ্‌গ্রস্ত এক যাত্রী ; অন্যত্র স্থানাভাবে এখানে আসিয়াছেন। চটের কিয়দংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিলাম।

একেই ত যাত্রাপথে ও বিদেশে লোকের সহিত অতি সহজেই পরিচয় হইয়া থাকে, তাহার উপর অতি অল্পক্ষণেই বুঝিলাম, নবাগত ভদ্রলোকটি অত্যন্ত গল্পপ্রিয় ও বেশ অমায়িক। আমাদের সদ্যস্থাপিত সৌহার্দ্য ক্রমশ জমিয়া উঠিল।

কথায় কথায় জানিলাম, তিনি আমাদের স্বদেশীয়। ছেলেবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় কার্য্যোপলক্ষে অনেক স্থানে ঘুরিয়াছেন। সম্প্রতি পশ্চিমে কোন রাজ-সরকারে চাকরী পাইয়া, আমাদের সঙ্গে এক ট্রেণে সেখানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এই দুর্ঘটনা।

সে দিন বেশ চাঁদনী রাত্রি। ক্ষীণ চন্দ্রালোকের একটুখানি, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে এই সময় কে গান ধরিয়াছে। সঙ্গীতের প্রতি কোন কালেই আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল না; উপরন্তু আজকাল কেহ গান গাহিলে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিতাম। কারণ, গান আদর করিবার ক্ষমতা আমার কোন কালেই ছিল না। স্কুল ও কলেজের পরীক্ষা দিতে দিতে আমার প্রাণ ত একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষান্তে যখন দেখিলাম, আমি মিউনিসিপ্যালিটীর ষাট টাকা মাহিয়ানার এক কেরাণী, তখন হইতে কলা-বিদ্যার উপর মনের ভাব কিরূপ হইল, আর বলিতে হইবে না। কিন্তু কি জানি কেন, যদিও গানটির অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি নাই (কারণ, উহা উর্দ্দু ভাষায় রচিত এবং আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর) সেইদিন গানটি বড় মিষ্ট শুনাইল। চতুর্দ্দিকের অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোমলকণ্ঠে সঙ্গীত। তখন প্রায় সমস্ত যাত্রিগণ গভীর নিদ্রামগ্ন। কেবল আমরা দুইটি প্রাণী অন্ধকারময় ষ্টেশন-কক্ষে গল্প করিতেছিলাম।

গানটি শুনিয়া আমার বন্ধুটি বলিলেন, "এই গানের সঙ্গে যে করুণ ইতিহাসটুকু আছে, আপনি সেটা জানেন কি? ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমে এই গানটি আরও দুই তিন বার শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে যে কোন বিশেষ ইতিহাস জড়িত থাকিতে পারে, তাহা আগে ধারণা ছিল না।"

"কৌতুহলপূর্ণস্বরে বলিলাম, "না, জানা নেই!"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তবে শুনুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন।

মীর আলি তরুণ কবি। শিশুর মতন তাহার সরল হৃদয়, অতি সুন্দর ও কোমল। সে ছিল সৌন্দর্য্যের উপাসক। যেখানে সৌন্দর্য্যের তিলমাত্র প্রকাশ, সেইখানেই তাহার মন ছুটিয়া যাইত। কুৎসিত বা কদর্য্য তাহার নিকট একেবারে অসহ্য। বিশ্বের মলিনতা তাহার তরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই সে অর্দ্ধোন্মেষিত পুষ্পের মত কোমল, প্রভাতের শুভ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল।

কিন্তু তাহার রচনা কেহ পড়িত না। কৃপণের ধনের মত সেইগুলি তাহার গৃহাভ্যন্তরে জমা থাকিত। সে দিকে লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। সে সৌন্দর্য্যে পাগল, ভাবে বিভোর। সে কেবল রচনা করিয়াই ক্ষান্ত।

মীর আলির পিতৃব্য এতদিন তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। সহরে তাঁহার রেশমের মস্ত কারবার। কত ধনী সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। একদিন তিনি নিতান্ত বিষয়ী লোকের মত মীর আলিকে বলিয়া পাঠাইলেন, হয় তাহাকে কাব্যরচনা দ্বারা টাকা আনিতে হইবে, আর নয় তাহাকে রেশমের কারবারে যোগ দিতে হইবে। বৃথা বাজে কাব্য লিখিলে আর চলিবে না। মীর আলি ভাবিল, তাহার কাব্য যে অর্থকরী নয়, সে জন্য কি করিবে? সে ত তাহার দোষ নয়। আর কারবার? সেও তাহার দুচক্ষের বিষ। কি করিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া সে কিছু সময় ভিক্ষা চাহিল।

সে দিন তাহার মন ভাল ছিল না। পিতৃব্যের এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত পৃথিবীর উপর ঘন বিষাদের কঠিন ছায়া চাপিয়া বসিয়াছে। ঘরে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। সে পথে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তার এক প্রান্তে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া এক কিশোরী বালিকা ভিজিতেছিল। অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপ-কুঁড়ির মতন সুন্দর, কেবল শীতের প্রারম্ভকালে, তুষার-কণার নিষ্ঠুর আঘাতে কিঞ্চিৎ মলিন। দারিদ্র্যের কঠোর সংঘাতে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি ঈষৎ বিবর্ণ। যৌবনের আগমন-সংবাদ বোধ হয় তাহার নিকট সবে পৌঁছিয়াছিল, তাই বালিকাসুলভ সরলতার উপর একটু সলজ্জ আভা।

মীর আলি তাহার নিকটে গিয়া কবির মত বলিল, "তোমাকেই ত আমি এতদিন খুঁজছিলাম।"

লজ্জাবশতঃ বালিকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমাকে?"

মীর আলির কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। আলিরও বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে তাহার সৌন্দর্য্যের আদর্শ আজ পাইয়াছে। আজ তাহার আত্মা পরিতৃপ্ত।

আবেগপূর্ণ স্বরে সে বলিল, "হাঁ তোমাকে!"

সে কিছুই বুঝিল না। অবাক্ হইয়া মীর আলির দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, তাহাকে দরিদ্র দেখিয়া সে ব্যঙ্গ করিতেছে। মীর আলি কিছুই লক্ষ্য করিল না। তাহার প্রবল ক্ষুধা মিটিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

নতমুখে মধুরকণ্ঠে কিশোরী বলিল, "আমার নাম দলিয়া।" মীর আলি ভাষা শুনিল কি বীণার ঝঙ্কার শুনিল, ঠিক করিতে পারিল না। কেবল তাহার কানের কাছে বাজিতে লাগিল, 'দলিয়া দলিয়া।'

উন্মত্তপ্রায় তরুণ কবি কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে?" দলিয়া দেখিল, অকূল সমুদ্রে একটু ঠাঁই মিলিল। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে যে বৃদ্ধার নিকট আশ্রয়

লইয়াছিল, সেও আজ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অপরাধের মধ্যে সে যথেষ্ট ভিক্ষা আনিতে পারিত না। এখন সে সংসারে একেবারে একলা, একেবারে আশ্রয়হীন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া 'হাঁ' কথাটা বলিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। অথচ দারুণ অভাববোধ একটু একটু করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে অতি-কষ্টে মৃদুস্বরে সে বলিল, "হাঁ যাব।"

মীর আলি আনন্দে অধীর। না, সে আজ একেবারে পাগল। বাড়ী পৌঁছিয়াই পিতৃব্যকে লিখিয়া দিল, সে আর তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী নয়, আজ থেকে সে নিজে উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

সন্ধ্যার সময় মীর আলি তাহার বন্ধু কাশিমকে লইয়া ফিরিল। কাশিম তাহারই মত নবীন, তাহারই মত সংসারানভিজ্ঞ। সে এক পুরান বইএর দোকানে কাজ করিত। আর অবসরসময়ে মাঝে মাঝে গানে সুর দিত। দুই বন্ধুতে দলিয়ার এখন নিত্য-সহচর। সহজ কথায় দুই জনে একসঙ্গে দলিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী! কিন্তু কাহাকে যে দলিয়া বিজয়মাল্য দিবে, তাহার স্থিরতা নাই।

কাশিম বলে, "আমি দলিয়াকে পূজা করি।"

মীর আলি কহে, "অনেক দিন পরে আমি আমার আদর্শ পাইয়াছি।"

এ দিকে তাহাদের হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তাহা ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। কাশিম ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে, মীর আলির মাসহারাও বন্ধ হইয়াছে।

সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া একদিন দলিয়া বলিল, "আমাকে সহরে নিয়ে চল, সেখানে গান গেয়ে আমি পয়সা উপার্জ্জন কর্‌ব।"

দুইবন্ধু স্থির করিল, তাহারা দলিয়ার জন্য কিছু একটা—বড় গোছের কিছু করিবে। তাহাকে যদি গানই গাহিতে হয় ত সে একেবারে নবাবের সম্মুখে গাহিবে। সকলকে একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিবে।

দুই জনে কার্য্যে লাগিয়া গেল। মীর আলি এক অভূতপূর্ব্ব গান রচনা করিবে, আর কাশিম তাহাতে সবচেয়ে ভাল সুর দিবে। সেই গান দলিয়া নবাবের দরবারে গাহিবে। কিন্তু গান তৈয়ারী হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইতে লাগিল।

দলিয়া দুই একবার কেবল উপহাসছলে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, গান কই?"

হৃদয়ে তাহার অপরিসীম আশা; সে ভাবে,—রূপে ও গীতে সে একদিন বিশ্ব জয় করিবে।

এখন মীর আলি ভাবে কেবল গান আর গান। দিবসে নিস্তব্ধ উদ্যানে বসিয়া ভাবে গান। রাত্রে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে সে নিজকক্ষে বসিয়া ভাবে কেবল গানের কথা।

অবশেষে সেই গান-রচনা শেষ হইল। হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়া, আত্মার সমস্ত করুণ-রস মিশাইয়া মীর আলি তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে। ছন্দের ভিতর দিয়া যৌবনের উদ্দাম প্রাবল্য, প্রাণের মত্ত ব্যাকুলতা, হৃদয়ের কারুণ্য প্রকাশিত।

কাশিমকে ডাকিয়া সে কহিল, "ভাই, ধৈর্য্য ধর, এবার আমি জিতিলাম!"

আর কাশিম? কয়েকদিন দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহার সুর ঠিক হইল।

আনন্দে অধীর হইয়া কাশিম বলিল, "এবার আমার জীৎ। এমনি করিয়া দুইজন সমস্ত প্রাণ দিয়া দলিয়ার জন্য গান প্রস্তুত করিল। লোকে এখন মীর আলির ও কাশিমের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। আছে শুধু তাহাদের গান ও দলিয়ার বিলাস আর উচ্ছৃঙ্খলতার কলুষ-কাহিনী।

তার পর সকলে মিলিয়া সহরে আসিল। লোকারণ্য নগরীর সাজসজ্জা দেখিয়া দলিয়া আশ্চর্য্য, মুগ্ধ। সে ভাবিল, দরবারে গান গাইতে যাইলে সে একেবারে মূর্চ্ছা যাইবে। দুই বন্ধুতে তাহাকে অনেক প্রবোধ দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবাব-দরবারে প্রবেশলাভ চেষ্টায় মীর আলি তাহার পিতৃব্যের এক ধনী বন্ধুর নিকট গেল। বন্ধুটি ত তাহার প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি মীর আলির কথায় রাজী হইলেন। দরবারে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার দলিয়াকে দেখিতে চাহিলেন; দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, দলিয়া একদিন তাহার রূপে পৃথিবী বশ করিবে। তিনি অবিলম্বে সমস্ত কথা নবাবকে খুলিয়া বলিলেন।

অতিশীঘ্রই মীর আলি সদলে নবাবের খাস দরবারে যাইবার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল। ইতিমধ্যে সারা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, কোথা হইতে দলিয়া নামে এক ওস্তাদ গায়িকা আসিয়াছে। কি তার রূপ আর কি তার গলা! শীঘ্রই সে নবাবের খাস দরবারে গাহিবে। সকলে তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু কোথায় আছে, কেহই জানে না।

আজ রাত্রে নবাবের প্রাসাদে খাস দরবার বসিল। সকলের মুখে কেবল দলিয়ার কথা। কাশিম ও মীর আলি কিছু অর্থ কর্জ্জ করিয়াছে। তাহাতে তিন জনের দরবারোপযোগী সাজসজ্জা তৈয়ারী হইল।

যাত্রার পূর্ব্বে মীর আলি বলিল, "দলিয়া, আজ বড় আনন্দের দিন, আমরা যেন দিগ্বিজয় করিতে চলিয়াছি। দেখো, সেখানে যেন ভয় পেও না।"

একটি ছোট 'না' বলিয়া দলিয়া চুপ করিল। অন্তরে তাহার আশা ও ভয় যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যাশেষে তিন জনে দরবারগৃহে প্রবেশ করিল।

কক্ষটি বিলাসের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অসংখ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভ সুদীর্ঘ

ছাদটিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সুবৃহৎ স্বর্ণখচিত দীপাধারগুলি সুগন্ধি তৈলে প্রজ্বলিত আলোক বিকীর্ণ করিতেছে; হর্ম্ম্যতলে বহুমূল্য কোমল গালিচা বিস্তৃত। চারিদিকে নীল রঙের মখমলের পর্দ্দা ঘেরা। সম্মুখে ঈষদুচ্চ প্রস্তর-মঞ্চের উপর স্বর্ণ-সিংহাসনে নবাব আসীন। সুসজ্জিত পারিষদ্ ও সভাসদ্গণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। ফুলের সৌরভের সহিত হেনা ও গোলাপের সুগন্ধ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। কাশিম ও মীর আলি এক কোণে আশ্রয় লইয়াছে। আজ তাহাদের আনন্দ অপরিসীম। আজ যে তাহাদের প্রাণের দলিয়ার বিজয়যাত্রা।

নবাবের ইঙ্গিতে দলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। জরীর কারুকার্য্যখচিত ফিরোজা রঙের পেশোয়াজ ও ওড়নায় তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল। ঠিক প্রস্ফুটিত চাঁপাফুলের মত, কিন্তু তাহাতে কেবল মাদকতা আছে, তীব্রতা নাই।

গায়িকার রূপ দেখিয়া সভাসদেরা চমক মানিল। যথারীতি অভিবাদন করিয়া দলিয়া কম্পিতকণ্ঠে গান আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সঙ্গীত খাদ হইতে অন্তরায় উঠিল। তখন তাহার লজ্জাটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গানে সে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিল। প্রসুপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় তাহার সুললিত কণ্ঠস্বর ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিল। সুমধুর স্বর কক্ষের প্রত্যেক প্রস্তরখানি স্পর্শ করিল,—চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে কাঁপাইয়া তুলিল। সমস্ত কক্ষখানি তাহা আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে নবাবের পদতলে ব্যাকুলভাবে লুটাইতে লাগিল।

নবাব নিজ কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা খুলিয়া লইয়া দলিয়াকে পরাইয়া দিলেন।

সেই দিনকার মত দরবার ভঙ্গ হইল।

পরদিন মীর আলি ও কাশিম দলিয়াকে তাহার কক্ষে খুঁজিতে আসিল। কেহই নাই। কেবল শূন্যহর্ম্ম্য তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিল।

একখানি পত্রখণ্ডের উপর দলিয়া লিখিয়া গিয়াছে, "আমার আশা সফল, আজ হইতে নবাবের অন্তঃপুরে আমার স্থান। তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাইও।"

হায়!

দুইজনে কক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

গান ও গল্প কখন্ যে শেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না। আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে নবাবের অভ্রভেদী শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ ভাসিতেছিল। আর দলিয়ার বিজয়দৃপ্ত আরক্ত মুখখানি ও প্রেমিকদ্বয়ের নিরাশমূর্ত্তি।

সহসা ভোরের শীতল বায়ু স্পর্শে আমার কল্পনাস্রোত থামিয়া গেল। দেখিলাম, আমার নবপরিচিত বন্ধুটি কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। ভাবিলাম, লোকটা আমাকে একটা বাজে প্রেমের গল্প বলিয়া বোকা বানাইয়া গেল।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাবাজি

দোল-পূর্ণিমার রাতে তখন খোট্টাদের গান, ভাঙের নেশার ধমকে একটা নিতান্ত বিকৃত বিকট বেসুরো চীৎকারে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত দিন মাদলের বাদ্যি, আর খঞ্জনির ঝন্ঝনানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। মনে হয়, পাশতলার দিক্‌টা ধ'রে যেন খাটটা কে তুলছে।

অবশ্য, ভূতের ভয় ছিল না; কিন্তু ঘরেও আর আট্‌কা থাকতে মন চাইলে না। অগত্যা দরজায় কুলুপ দিয়ে সটান বেরিয়ে পড়্‌লাম।

বাঙ্গালিটোলার অন্ধকার—জঘন্য গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। রাজবাড়ীর ঘণ্টায় তখন ঢং ক'রে একটা বাজ্‌ল।

রাস্তায় লোকজন নেই; জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্‌ করচে। ধবধবে পথের উপর জায়গায় জায়গায় ফাগ প'ড়ে আছে—হঠাৎ দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

মন উদ্‌ভ্রান্ত, কাজেই পায়ের মর্জ্জিমত যেদিকে-সেদিকে চল্‌লাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম যে, গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়াটা মানুষের কাছে কতখানি মধুর হ'তে পারে।

কয়েকটা সিঁড়ি নেমে একটা বড় চাতালে গিয়ে বস্‌লাম। দূরে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে পড়ে বিষম নাক ডাকাচ্চে। মনে হলো, বেটা নেশা করেছে।

চাঁদের আলোর নীচে গঙ্গার স্ফটিক-জল একখানা বিরাট শ্লেটের মত দেখাচ্ছিল। ও-পারে বালির চর ধূ ধূ করচে—তার পরে রাজবাড়ীর ফাটক হাঁ ক'রে আছে! যেন বুড়োর ফোক্‌লা-হাঁ!

বাঁ-দিকে মণিকর্ণিকার আগুন জ্যোৎস্নায় নেহাৎ ঢিমে দেখাচ্ছিল। সার সার তিনটে চুলী—জলের উপর আলো প'ড়ে ঝক্‌-ঝক্‌ করচে! যেন কষ্টি-পাথরে তিনটে আঁকা-বাঁকা সোনার আঁচড়।

চারিদিক্‌ স্তব্ধ। দে'খে যেন বুকের মধ্যে হাঁপ লাগ্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ বুকের ভিতর থেকে একটা দম্‌কা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে পড়্‌ল! কেন? কি জানি!

ঠাণ্ডা হাওয়াতে যেন দেহ জুড়িয়ে গেল; হাই উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হাঁটু দুটোর মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়্‌বার মত হয়েছি—পিঠের উপর কার গরম হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম; সঙ্গে সঙ্গে শুন্‌তে পেলাম "বেটা, ঘর যাও!"

ফিরে দেখি, কখন্ লোচন বাবাজি এসে আমার কাছে বসেছেন। তাড়াতাড়ি বাবাজির পায়ের ধুলো নিতেই তিনি হেসে বল্‌লেন, "কি রে, এত রাত্রে যে এখানে? ঝগড়া করেছিস্ নাকি?"

বাবাজির অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। শীর্ণকায় লম্বাকৃতি পুরুষ। ইনি সর্ব্বস্ব-ত্যাগী কৌপীনধারী; কিন্তু বাবাজির যত বড় বড় রাজা-মহারাজ শিষ্য। কাশীর প্রায় সকলেই তাঁহাকে চেনে; দীর্ঘদিন কাশীবাস করাতে অনেকের সঙ্গে তাঁহারও পরিচয়। বাবাজি আমাকে একটু স্নেহই কর্‌তেন।

আমার পিঠ ঠুকে বাবাজি বল্লেন, "পাগ্‌লা—রাগ বড় পাজী জিনিষ—ফিরে যা।"

"আমি ত রাগ করি নি মহারাজ! ঘরে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ল না, তাই এসে এখানে ব'সে আছি।"

"তোর বৈরাগ্য হয় নাকি?" ব'লে বাবাজি হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

বাবাজির সঙ্গে অনেকবার আলাপ করেছি; কিন্তু আজ তাঁর মধ্যে এমন একটা আত্মীয়তার ভাব দেখলাম যে, হঠাৎ তাকে তাঁর জীবনের ইতিহাসটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ কর্‌লাম না।

বাবাজি একটু হেসে বল্‌লেন,—"আচ্ছা, তোকেই বল্‌ব—এ পর্য্যন্ত কেউই জানে না, আমি কে—কোত্থেকে এসেছি।"

বাবাজি তাঁর জীবনকাহিনী সুরু কর্‌লেন,—

* * * * *

"আমি বিলাসপুরের জমিদারের ছেলে। লেখাপড়া একেবারে করি নি যে, তা নয়; তবে কোন পাশটাশ করি নি—কর্‌বার বড় একটা তোয়াক্কাও রাখ্‌তাম না। হাতে যখন বিষয়-সম্পত্তি এলো, তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ। বিয়ে হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তেমন বনি-বনাও হ'ল না। কেন, তা বুঝ্‌তেই পার।—ঘরের মেয়েরা আমোদটাকে তেমন ঝাঁঝাল ক'রে তুল্‌তে পারে না। আমার কিন্তু সে ধাতই নয়। পেন্-পেনানি ঘেন্-ঘেনানির মধ্যে আমি নেই। যা চালাব, তা পুরো দমেই দস্তরমত। এই পথে নিয়ে যাবার লোকেরও অভাব হয় না। টাকা যখন থাকে, তখন কিছুরই অভাব হয় না।

কল্‌কাতায় ধাঁ ক'রে একখানা বাড়ী কিনে ফেলা গেল। সেখানে দিন-রাত আমোদ-আহ্লাদ। মদ এবং মেয়েমানুষের শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারীর শ্রাদ্ধও হয়ে এলো। বছর দুয়ের মধ্যে জান্‌তে পার্‌লাম, দেনা এত হয়েছে যে, তাকে ডিঙ্গিয়ে উত্তীর্ণ হবার উপায় নেই।

হঠাৎ একদিন কল্‌কাতার বাড়ীতে আমার স্ত্রী এসে কাঁদাকাটি ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে পড়্‌ল—বলে—"করছ কি, শেষকালে কি পথে দাঁড় করাবে ?"

এ সব বিষয়ে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতা ব'লেই মনে হ'ল। রাগের মাথায় আর নেশার ঝোঁকে স্ত্রীকে পদাঘাত কর্‌লাম—কর্‌তেই—স্ত্রী তখন গর্ভিণী ছিলেন—গর্ভপাত হয়ে তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁকে আর পথে দাঁড়াতে হ'ল না!

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার অভাবটা একটু একটু মনে হোত। মনে হ'ল, দিনরাত ঝড়ের মত মাতামাতি ক'রে এক আধবার মাথা রাখ্‌বার জন্য ছোট-খাট একটু স্থান না থাকলে কেমন ক'রে বাঁচি।

হঠাৎ সব বন্ধ ক'রে দিলাম। বেগতিক দে'খে বন্ধু-বান্ধবেরাও স'রে পড়্‌লেন। আমিও কল্‌কাতার বাড়ী বেচে বিলাসপুরে ফিরে এলাম।

এখানে সব যেন খালি মনে হোত। এত বড় বাড়ীখানির মধ্যে সে এমনি ক'রে আপনাকে জড়িত ক'রে রেখে গেছে, তার কথা মনে না ক'রে এক মিনিট কাটাবার উপায় নেই।

প্রথমে যা ভাল লাগ্‌ত, শেষে তা বিরক্তিকর হয়ে উঠল। এমন হ'ল যে, বিলাসপুর ছাড়াই স্থির কর্‌লাম।

যাই কোথা ? এমন জায়গা কোথায় আছে—যেখানে মনের জ্বালা জুড়াতে পাই ?

মনে হ'ল, তীর্থ ক'রে এলে মন শান্ত হবে। কত দেশ, বিদেশ ঘুরে কোথাও শান্তি পেলাম না। অবশেষে বৃন্দাবনে এলাম।

আহা, কি মধুর স্থান! একখানি ছোট বাড়ী নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করতে লাগ্‌লাম। কিছুদিন বাস করার পর জান্‌তে পার্‌লাম যে, আমি আবার জড়িয়ে পড়্‌চি। কিন্তু তখন নিরুপায়! একটি মেয়ে হ'ল। প্রথম যে দিন মেয়েটিকে দেখলাম, সেই দিনই বৃন্দাবন ত্যাগ কর্‌লাম। মেয়েটির মুখ কেমন ক'রে কি জানি, ঠিক যেন আমার স্ত্রীর মতই হয়েছিল। হঠাৎ মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। বোষ্টমীটাকে বাড়ীখানা লিখে দিলাম। কিছু নগদও দিলাম। এ জন্মে আর বৃন্দাবন যাই নি।

বিলাসপুরে ফিরে এসে দেখলাম, জমীদারি নীলামে উঠেছে। তার পর বিক্রী হয়ে গেল! যাক্‌, বাঁধন গেল।

কল্‌কাতায় ফির্‌লাম। এইবার তার স্বরূপ দেখ্‌লাম। পুরাণ দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা চিন্‌তে পার্‌লে না। মানুষ মানুষকে চেনে না। মানুষ টাকা চেনে। যার টাকা নেই—তার কিছু নেই।

আজন্ম নবাবি ক'রে একদিন সকালে যে কাঙাল হয়ে পথে দাঁড়ায়, তার কি লজ্জা, তা বলা যায় না।

মনে করলাম, আত্মহত্যা করি ; কিন্তু ভয় হলো। মরতে ভয় পেলাম। এত কষ্ট, তবুও বাঁচতে সাধ!

ভিক্ষা করতে লজ্জা হ'ল। তার চেয়ে চুরি করা ইজ্জতের কাজ মনে হ'ল। যে দিন চোরের জগতে নেমে পড়লাম, সে দিন দেখলাম, আর একলা নই। অনেক দোসর জুটলো।

গুরু দীক্ষা দিলেন—বললেন, চুরি কে না করচে?—কেউ বা চালাকি করে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে—আর কেউ বা সরলভাবে। অবশ্য, আমি সরল পথেই চললাম।

পুলিসের সঙ্গে বেশ আলাপ হলো ; যেটা লাভ হ'ত, তার আট আনা অংশ তার হাতে তুলে দিলে কোন ভয় নেই।

কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না। একদিন আমাদের দল ধরা প'ড়ে গেল। গুরুদেব যথা-সময়ে পালিয়ে বাঁচলেন। আমার চেহারা ছিল ভাল—পুলিস আমাকেই দলপতি ঠাউরে নিয়ে ঠেলে দিলে।

মামলার যখন শেষ হলো, তখন জানলাম যে, কলকাতা সহরে এতদিন যত কিছু চুরি-ডাকাতি হয়েছে, সে সব আমারই নেতৃত্বে! তাই আমার কিছু লম্বা রকম জেল হলো।

হলো ভাল। নিরাশ্রয় আশ্রয় পেলে। জেল জায়গাটা মন্দ নয়। একটু বনিয়ে চলতে পারলে সেখানেও বেশ চালিয়ে দেওয়া যায়।

কিছু দিন ঘানিতে কাজ করলাম। অসুখ হয়ে যেতে সহৃদয় ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এ কাজ এ পারবে না।' হাঁসপাতালের অন্ন ধ্বংস ক'রে বা'র হয়ে—ছাপাখানার কাজে ভর্ত্তি হলাম। বেশ লাগল। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করাতে—উন্নতি হলো—প্রুফ-রিডার হলাম। এমনি ক'রে কিছু দিন কাটাতেই শুনলাম, আমার নাকি কিছু ক'রে মাইনে বরাদ্দ হয়েছে—সেটা বা'র হবার সময় পাবো।

জেলে যখন ঢুকেছিলাম, তখন চুল ছিল কালো—যে দিন বেরুলাম, সে দিন সব সাদা।

জেলার সাহেব ডেকে বললেন, 'যদি তুমি জেলে কাজ করতে চাও ত তাও করতে পার ; নহিলে তোমার ৪০০৲ টাকা আছে, তা নিয়ে ব্যবসা করেও দিন কাটাতে পার। আশা করি—আর পাপের পথে যাবে না।'

আর জেলে থাকতে ভাল লাগল না—বেরিয়ে পড়লাম। সটান্ এসে জগন্নাথ ঘাটে স্নান ক'রে উঠে এক বাবাজির ধুনীর পাশে জায়গা নিলাম।

বাবাজি গাঁজার কলিকায় দম দিয়ে তাঁহার প্রসাদ দিলেন। জেলে থাকতে গাঁজাটার অভ্যাস হয়েছিল। কয়েদীরা ত্বরিতানন্দকেই বেশী পছন্দ করে।

গাঁজা টেনে ভম্ হ'য়ে বাবাজির পাশেই ব'সে রইলুম। তুপুরের সময় বাবাজি উঠ্‌লেন; আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌লাম।

বাবাজি হেসে বল্‌লেন, 'কাঁহা যায়েগা?'

'আপনার সঙ্গে।'

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বাবাজি 'আচ্ছা আও' ব'লে চল্‌লেন।

*　*　*

বাবাজি যেখানে থাক্‌তেন—তা আমার খুবই পরিচিত স্থান। যখন কাপ্তেনি কর্‌তাম, তখন এখানেই আমার ঘরবাড়ী ছিল।

একটা দোতালা বাড়ীর নীচের তালায় বাবাজির স্থান। হয় ত কিছু ক'রে ভাড়া দিতে হয়। বাবাজির ভৈরবী নাই; কিন্তু তার অভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবার কোন আশঙ্কা ছিল না!

প্রথম দিন বাবাজির মুটের কাজে ভর্ত্তি হলাম। দ্বিতীয় দিন পাচকের কাজ কর্‌লাম। তৃতীয় দিন বাবাজি অর্দ্ধচন্দ্র দান কর্‌লেন।

স্রোতে আবার গা ভাসালাম। সমস্ত দিন অনাহারে কাট্‌ল। সন্ধ্যার সময় ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেলাম। পেটে ভার পড়াতেই চোখে ঘুম এল; কিন্তু শুই কোথায়?

উদ্‌ভ্রান্ত-মনে পথে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে একটা গ্যাসের তলায় একখানা মুখ দে'খে হঠাৎ বুক্‌টা ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌তে লাগ্‌ল। আর এক পাও চল্‌তে পার্‌লাম না। একদৃষ্টে সেই পদ্মের মত সুন্দর মুখখানা দেখতে লাগ্‌লাম।

খানিকক্ষণ পরে শুন্‌তে পেলাম, কে বল্‌চে—'ওলো স'রে দাঁড়া—স'রে দাঁড়া—দেখচিস্ নে,—বুড়োর ধাঁধা লেগে গেছে। আ মরণ, বুড়োর রকম দেখ!'

নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ ভাবে সেখানে যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, জানিনে। বুকের মধ্যে আগুনের হল্‌কা চল্‌ছিল। শেষকালে সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি আমার হাত ধ'রে তার ঘরে নিয়ে গেল।

ছোট্ট খোলার ঘর। পরিপাটী বিছানা। মেজেতে মাতুরে বস্‌লাম। মেয়েটি তামাক সেজে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'বামুন?' আমি ঘাড় নাড়তেই হাতে হুঁকো পেলাম। মনের আনন্দে তামাক টান্‌তে লাগ্‌লাম।

ঘরের দেওয়ালে অনেক রকমের ছবি। কালী তারা ত আছেই। দূরে কুলুঙ্গীর মধ্যে একখানা ছবি দেখলাম—সেটাতে ফুলের মালা দেওয়া; চন্দন ছেটান। প্রত্যহ ধূনো দেওয়াতে ছবিখানা অন্ধকার হয়ে গেছে।

মেয়েটি আমার পায়ের কাছেই ব'সে ছিল। বল্‌লাম, 'মা, ওটা কি?'

'কোথায় ?'

'ওই কুলুঙ্গীর মধ্যে ?'

'ও আমার বাবার ছবি।'

'নিয়ে এস ত দেখি।'

ছবিখানা নিয়ে এল। ছবিখানা দে'খে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। 'হাঁ, মা, এ ছবি কোথায় পেলে ?'

'আমার মা দিয়ে গেছেন। তিনি রোজ একে এমনি ক'রে মালা চন্দন দিয়ে পূজো কর্‌তেন। আমিও তাই করি।'

বুকের মধ্যে আমার যেন একটা ব্যথার সমুদ্র তোলপাড় ক'রে গেল। 'সর্ব্বনাশ! এ কে ?'

'অমন ক'চ্চেন কেন ?'

আমি কোন কথার উত্তর দিতে পার্‌লুম না। আমার মনে বোষ্টুমীর কথা জেগে উঠ্‌ল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, কি আকর্ষণে সে দিন সন্ধ্যায় মেয়েটা আমাকে টেনেছিল।

ছবিখানার দিকে চেয়ে হাসি এল—পাগল তোরা, কার পূজো কর্‌চিস্‌ ?

ঘর যেন চিতার জ্বলন্ত আগুন মনে হোল।

আমি উঠে কুলুঙ্গী থেকে ছবিখানা নিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লাম।

আর সেই মেয়েটার পায়ের কাছে জেলের কামান চার শ' টাকার চারখানা নোট ছুঁড়ে—ছুট—ছুট—একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে।

তার পর এই দেখচ আমাকে।"—বাবাজি দ্রুতপদে চ'লে গেলেন।

তখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নহবতখানা থেকে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ললিতের সুর উষার ঈষদুজ্জ্বল আকাশের পানে উঠ্‌ছিল। দূরে একজন গঙ্গা-সলিলে স্নান কর্‌তে কর্‌তে গাইছিল,—

"আনন্দ-ভবন গিরিজাপতি-নগরী,
মন কাহে নহি বাস লাগাওত।"

শ্রীঃ—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তত্ত্ব-বিচার

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র-নাথের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম ছিল "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম।" কিন্তু বেদের প্রামাণ্য লইয়া যখন সন্দেহ ও কলহ উপস্থিত হইল, তখন হইতেই উক্ত নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, তৎস্থানে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই নূতন নাম গৃহীত হইল। "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম"—এই নাম উঠাইয়া দিতে দেবেন্দ্রনাথ কোন আপত্তি করিলেন না। পরন্তু তাঁহার সঙ্কলিত ধর্ম্মগ্রন্থের নাম তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" রাখিলেন. এবং এই নামেই ব্রাহ্ম-সাধারণের মধ্যে ঐ গ্রন্থ তিনি প্রচার করিলেন। কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মগণ নির্ব্বিবাদে দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ" বলিয়া স্বীকার ত করিলেনই না, পক্ষান্তরে, অক্ষয়-কুমার, রাখালদাস প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, ঐ গ্রন্থ কিছুতেই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ হইবার যোগ্য নহে। কেবল যে ঐ গ্রন্থে স্ববিরোধী শ্রুতিবাক্যের খামখেয়ালী সমাবেশ আছে, তাহাই নহে, ঐ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। "ধর্ম্মোন্নতি-সংসাধন" এবং "ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান আন্তরিক অবস্থা-বিষয়ক পর্য্যালোচনা"—প্রভৃতি পাঠ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ সম্বন্ধে তখনকার ব্রাহ্মদের মনের ভাব কিঞ্চিৎ জানা যায়।

সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম, বেদমান্যকারী হিন্দুদিগের ধর্ম্ম নহে। ইহা দেবেন্দ্র-নাথের স্বেচ্ছাকৃত। বেদের প্রামাণ্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং "বেদান্ত-প্রতি-পাদ্য সত্যধর্ম্ম" এই নাম উঠাইয়া দিতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, তার পর নিজের ধর্ম্মকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ" স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করিয়া, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের এমন এক ব্যবধান সৃষ্টি করিলেন, যাহার ইঙ্গিত এইরূপ যে, যাহা হিন্দু-দিগের ধর্ম্ম, তাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম নয়। এমন কি, "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" হইতেও দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পৃথক্। যতদিন ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" এই নামে অভিহিত ছিল, ততদিন হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের একটা মিলনের দৃঢ় সেতু বিদ্যমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়া, বা না বুঝিয়া যেরূপেই হউক, সেই সেতুকে ভগ্ন করিয়া দিলেন। ইহার ২৫ বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খৃঃ অঃ তিন আইনের ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইহাতে নাকি

হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক মিলনের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে বেদের ধর্ম্মকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া, তৎস্থানে ব্রাহ্ম-নামধের ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া, ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মিলনের সর্ব্বপ্রকার পথ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ২৫ বৎসর পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়াছিলেন। কেননা, যাঁহারা বুদ্ধদেবের কথাতেও বেদ-পরিত্যাগে কুণ্ঠিত ছিলেন—তাঁহারা যে হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথের খাতিরে সেইরূপ কার্য্য করিবেন,—অন্ততঃ বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণ এতদূর দুঃসাহসী,—ইহা ত কোনক্রমেই ভাবা যায় না। রাজা রামমোহন তাহা সবিশেষ বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার প্রণালীই তাহার প্রমাণ। রামমোহনের শাস্ত্রাদিতে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অমানুষিক প্রতিভা-বলে—যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তিনি হিন্দুদিগের সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথ, আমার বিশ্বাস, তাহা কিছুমাত্র না বুঝিয়া, রামমোহনের ঠিক সোজা-উল্টা পথে চলিয়া এবং চালাইয়া, রামমোহনের নামাঙ্কিত সংস্কারসঙ্ঘকে জাতির বিশালতর প্রাণ ও শরীর হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্ভবতঃ অনর্থক বিপন্ন করিয়াছেন। হয়ত ইহা দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হইলে কি হয়; দৈব প্রবল আর কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। রামমোহনের সংস্কারকে দেবেন্দ্রনাথ অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন,—এই বিশ্বাস বহুপরিমাণে অন্ধবিশ্বাস, এবং এই সংস্কার বহু পরিমাণে কু-সংস্কার। অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কার পরিহারের যুগে আমরা যেন ধীরভাবে ইহার বিচার ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। কেননা, 'অন্ধ' এবং 'কু' কোন কিছুরই ভাল নয়।

যাহা হউক, দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম হইতে পাবে না, এবং দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম—সকল ব্রাহ্মেরও ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমারও একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হইলেও,—তাঁহার ধর্ম্মমতও, কি ইতিহাস-বিচারের দিক্ দিয়া, কি মতের বিশেষত্ব ও গুরুত্বের দিক্ দিয়া, কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। অথচ দুঃখের সহিত আমি বলিতে বাধা বোধ করিতেছি না যে, সংস্কার-যুগের ইতিহাসলেখকগণ এতাবৎ দেবেন্দ্রনাথের তুল্য ও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—অক্ষয়কুমারকে বহু পরিমাণে কেবল ঠেস্ করিয়া, অকৃতজ্ঞতার অমার্জ্জনীয় অপরাধ অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" হইলে,—অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" হইবে না কেন? রামমোহনের দোহাই দেবেন্দ্রনাথ দিয়াছেন, আর অক্ষয়কুমার কি দেন নাই? দেবেন্দ্রনাথ যে রামমোহনকে ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা এই অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত গড্ডলিকা-প্রবাহ বা আরও অন্যান্য প্রবাহে ভাসমান বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকসমাজের দৃষ্টিকে কোন ক্রমে এড়াইলেও তাহা যে অক্ষয়কুমারের চক্ষুকে এড়াইতে পারে নাই—

ইহার প্রমাণের ত অভাব নাই। কিন্তু নিজের ধর্ম্মমতকে দশের ধর্ম্মমত বলিয়া প্রচার করিবার অনুকূল (বা প্রতিকূল?) যে উগ্র প্রভুত্বাভিমান একের ছিল, অন্যের তাহা ছিল না। অক্ষয়কুমার যুক্তিপন্থী জ্ঞানযোগী ছিলেন; তিনি 'আদেশ' পাইয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" সঙ্কলন করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আর সেরূপ বলিলেও যে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহা শুনিবে, এরূপ বিশ্বাসও সম্ভবতঃ তাঁহার কম ছিল। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রামমোহন বা সমীপবর্ত্তী অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি, এবং ইহাঁদের পরস্পরের ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য হইতে একদিকে যেমন ইহাঁদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে—অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্ম সাধারণগণ, তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মিল বা গরমিল কাহার সহিত কতটা, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের দিক্ দিয়াও বা অবনতির—ইহার একটা মূল্য আছে।

আমি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মকে সুতরাং ইতিহাস ও সত্যের খাতিরে সকল ব্রাহ্মের সাধারণ ধর্ম্ম—ইহা অস্বীকার করিতেছি। অথচ ইহাকে দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া মানিয়া লইয়া, উক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমতের যে দার্শনিক ভিত্তি দেবেন্দ্রনাথ দিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

"হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যর শ্রীরবীন্দ্রনাথ

আজকাল ভাবরাজ্যে ও ব্যবহাররাজ্যে, জ্ঞান, দর্শন, চারিত্রের, সাহিত্য, শাস্ত্র ও কলাকৌশলের যেরূপ চালনা ও আলোচনা হইতেছে, তাহার ঠাঠ-ঠমক, লক্ষণা-লক্ষণ ও গতিবিধি রাগবিরাগ-শূন্য হৃদয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, আমরা এক যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে আসিয়াছি। ইহা আদর্শ-বাস্তবের প্রবীণ-নবীনের, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। সন্ধ্যাই সন্ধিক্ষণ। দিবারাত্রি-সম্বন্ধি দণ্ডদ্বয়রূপই ইহার স্বরূপ। ইহাই সাধকের যোগ-সঙ্কটাবস্থা। এই যোগ-সঙ্কটাবস্থায় অবিদ্যাস্বরূপিণী মায়া আসিয়া, আপনার মোহজাল বিস্তারপূর্ব্বক সাধককে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। সাধকের সিদ্ধি-সাধন-পথে এই মায়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; নিত্য নব নব মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধককে বিমোহিত, আদর্শ হইতে বিচ্যুত করে। অথবা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণানন্তর সাধনার আসন হইতে তাহাকে বিতাড়িত করে। যিনি আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও এক-নিষ্ঠ, যিনি আপনার আদর্শের ধ্যান-মহিমায় বিভোরত্ব নিবন্ধন, অবিদ্যাস্বরূপিণী কুহকিনী বিলাসিনী ললিতাঙ্গীর চরণ-নূপুর-মুখরিত ললিত ঝঙ্কারে বধির; লালসা-লোলুপ রূপের তরঙ্গে যিনি অন্ধ; চিত্ত-বিভ্রমকারী কুসুম সুবাসিত মৃদুমলয়-হিল্লোলেও যিনি অবিচলিত; তিনিই কেবলমাত্র এই যোগসঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধির বিজয়মাল্য লাভ করিতে পারেন। জগৎপূজ্য তথাগত এই সাধন সম্পত্তি-চতুষ্টয়ের বলেই সাধনায় মা-'র বিজয়ী হইয়া 'বহুজনহিতায় সুখায়' বুদ্ধরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। সয়তান কর্ত্তৃক কণ্টকাকীর্ণ সাধনার পথ অবলীলাক্রমে পার হইয়াছিলেন বলিয়াই খৃষ্ট আজ এই ধরাতলে ত্রাণকর্ত্তারূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

ব্যক্তির জীবন যে নিয়মাধীন, জাতীয় জীবনও ঠিক সেই নিয়মাধীন। ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধিসাধন-পথে যেমন যোগসঙ্কটাবস্থা আছে, জাতীয় জীবনের সিদ্ধি সাধনেও ঠিক্ সেইরূপ যোগ-সঙ্কটাবস্থা আছে। এই যোগসঙ্কটাবস্থাই জাতীয় জীবনের যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণই জাতীয় জীবনের সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাবসানে জাতীয় জীবনে কোমল রবিকরোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ-মলয়-সুবাসিত সুপ্রভাত আসিবে, কিংবা ঘোর অমানিশার নিবিড়চ্ছায়া ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, তাহা আমাদের জাতীয় সাধকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে।